সাঁকো

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার এই পরিশ্রমের ফল কী যে হবে জানিনা। তবে, ঈর্ষা যদি বেশি হয় মাঝে মাঝে তা স্নেহ ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ আমি সুরসেনের কাহিনী বলব। এই কাহিনী শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।" বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে একটি নদীর দুই তীরে দুটি দেশ ছিল। অনাদিকাল থেকে দুই দেশের রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকায় উভয় দেশের প্রজাদের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক গড়ে

উঠেছিল। তুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এক দেশ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অন্য দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। উভয় দেশের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নদীর উপর একটি সাঁকো ছিল।

এইভাবে চলছিল বহুকাল ধরে। তারপর কোন এক কারণে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। উভয় দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ না বাধলেও যার দিকে সাঁকোর যে অংশ ছিল সে তা ভেঙে ফেলল। ফলে সাঁকোর উপর দিয়ে যানবাহনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। তবে নৌকো করে লোকের যাতায়াত তখনো বজায় ছিল। যাতায়াতের পথ ভেঙে ফেলায় সেই সুন্দর সাঁকোর দিকে তাকিয়ে বহু প্রজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত।

এর আরও কিছুকাল পরে তুই দেশের রাজারা মারা গেল। তাদের ছেলেরা হল রাজা। নদীর বাঁ দিকে ছিল রাজা শান্তিসেন আর ডানদিকে ছিল রাজা সুরসেন। তুজনেই ছিল বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান। ওদের আমলে প্রজারা মোটামুটি সুখেই কাটিয়েছিল।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে সুরসেন একটি বিষয় জানতে পারল সেটি হল তার প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন মনে মনে

শান্তিসেনকে পছন্দ করে। এমন কি নিজেদের মধ্যে তাকে প্রশংসাও করে। শান্তিসেন নাকি মস্তবড় দাতা। সুরসেন ভাবল, আমিও তো দানধর্ম করি। আমার কথা কি একই ভাবে শান্তিসেনের দেশের লোক বলাবলি করে ? এ ধরণের নানা কথা ভেবে সে আরও বেশি করে দানধর্ম করতে লাগল।

হঠাৎ সুরসেন বেশি করে দানধর্ম করায় তার সুনাম হওয়ার পরিবর্তে দুর্নাম হল। লোকে বলাবলি করল, "সুরসেন রাতারাতি বেশি করে দান করে শান্তিসেনকে খাটো করার চেষ্টা করছে। এইভাবে কাউকে খুব ছোট করা যায়না।"

গুপ্তচরদের মাধ্যমে এই কথা কানে যেতেই সুরসেন ভীষণ রেগে গেল। শান্তিসেনের উপর তার এত ঈর্ষা হল যে রাত্রে তার ভাল ঘুম হত না।

শেষে সুরসেন ঠিক করল, ছদ্মবেশে শান্তিসেনের রাজ্যে গিয়ে শান্তিসেন কী করে তা নিজের চোখে দেখবে।

তারপর সুরসেন মন্ত্রীদের উপর কাজকর্মের ভার দিয়ে সাধারণ পোশাকে নৌকো পেরিয়ে শান্তিসেনের দেশে ঢুকল। একটা ধর্মশালায় থেকে কান খাড়া করে সুরসেন শান্তিসেনের প্রজাদের কথা শুনতে লাগল। শুধু আশ্রমে নয়, ঘুরে বেড়িয়েও সে প্রজাদের কথা শুনতে
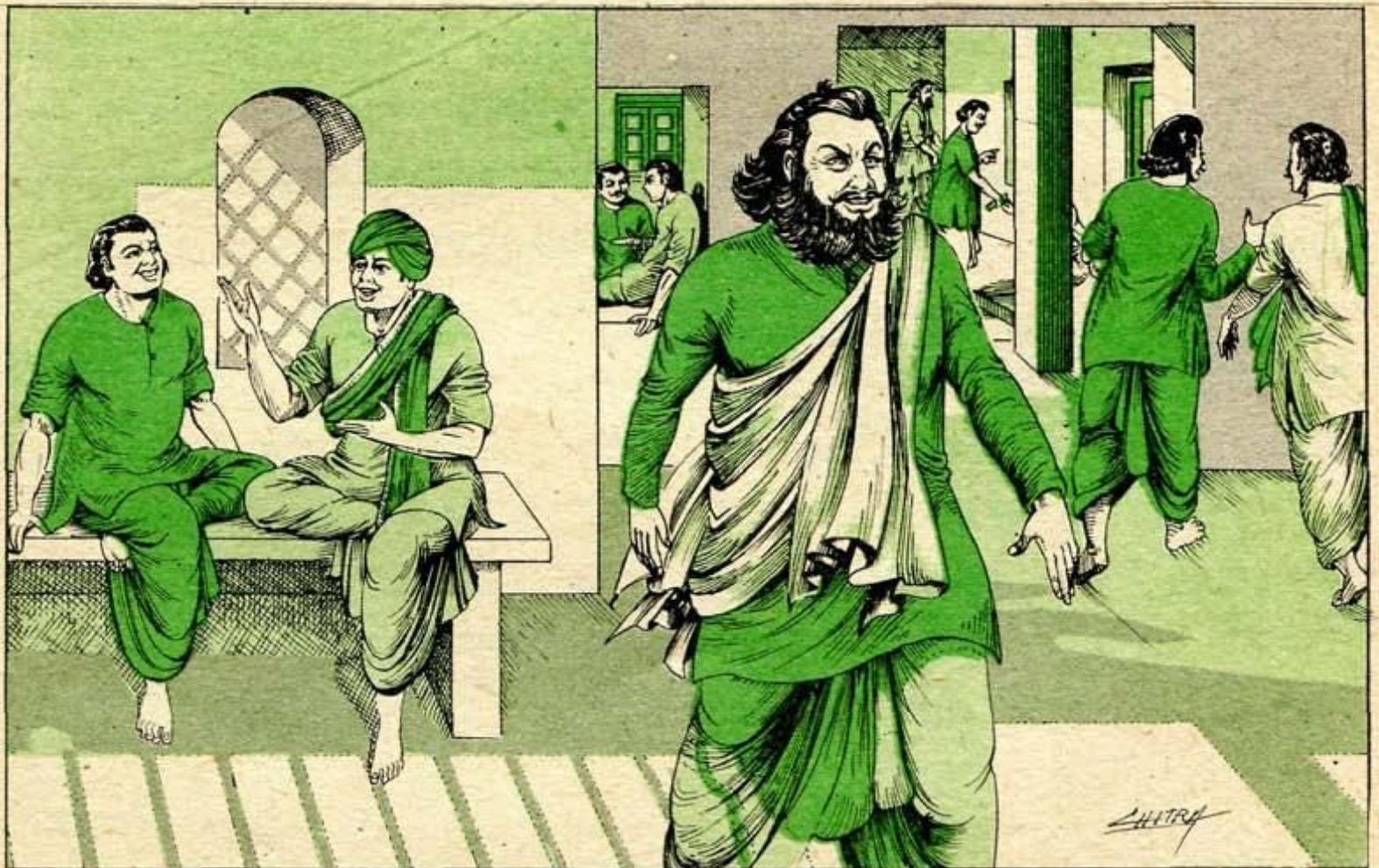
লাগল। প্রবাদ আছে, দূরের পাহাড় মসৃণ। কিন্তু দেখা গেল শান্তিসেনের বেলায় সেটা খাটে না। তার প্রজারাও তাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে।

ঘুরতে ঘুরতে, অনেক খুঁজেও, সুরসেন এমন একজনকেও পেল না যে তার প্রশংসা করে। এইভাবে অনেকদিন ঘুরে সুরসেনের ইচ্ছে করল নিজে গিয়ে শান্তিসেনকে পরীক্ষা করার। সে গেল শান্তিসেনের রাজপ্রাসাদে। যে-সময় রাজা সুরসেন গেল, সেই সময় রাজা সিংহাসনে বসে ছিল। তরে কোন একজন প্রজা দেখা করতে এসেছে শুনেই শান্তিসেন তার সঙ্গে দেখা করতে সাগ্রহে এগিয়ে এল। সুরসেন লক্ষ্য করল, শান্তিসেনের গায়ে সাধারণ পোশাক। তার আচার আচরণও অতি সাধারণ। এসেই বলল, "বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?"

সুরসেন বলল, "মহারাজ আমিও রাজবংশজাত। আমিও একসময় একটি দেশের রাজা ছিলাম। বিশেষ কারণে আমি আমার সিংহাসন হারিয়েছি। শুনেছি আপনি নাকি মস্তবড় দানশীল। তা আপনি কি আপনার রাজত্বের অর্ধেকটা আমাকে দান করবেন ?"

শান্তিসেন হেসে বলল, "আপনি যে মহারাজা সুরসেন তা আমি জানি।" শান্তিসেনের বলার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে যে প্রহরীরা ছিল তারা তরবারি বের করল। কারণ তাদের চোখে এই সুরসেন হ'ল শত্রু রাজা।

তৎক্ষণাৎ শান্তিসেন ওদের তরবারি নামাতে বলে সুরসেনকে বলল, "সুরসেন, আপনার একটি দেশ আছে। সিংহাসনও আছে। তবে তাতে আপনার চাহিদা মিটছে না। তাই আপনি আমার গোটা রাজত্বই নিয়ে নিন। আমি সানন্দে দিয়ে দেব। আমি সাধারণ মানুষের

মত সাধারণ ভাবেই বাঁচতে চাই।”

রাজা শান্তিসেনের এই উদারতায় ও সরলতায় রাজা সুরসেন মুগ্ধ হল। শান্তিসেন যে শুধু নামেই নয়, কাজেও শান্তিকামী সুরসেনের সে-কথায় আর কোনো সন্দেহ রইল না। তাই—সঙ্গে সঙ্গে সুরসেন শান্তিসেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, “আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে সাঁকোটা ভেঙে গেছে সেটা সারিয়ে তোলাই এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ।”

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, “রাজা, শান্তিসেন কত বড় দানবীর যে অর্ধেক রাজত্ব চাইলে পুরোটাই দিতে চেয়েছিল? দিতে যখন চেয়েছিল সুরসেন নিয়ে নিতেই তো পারত। রাজত্ব নিয়ে শান্তিসেনকে যাতে সবাই ভুলে যায় তার ব্যবস্থা করতে পারত। তা না করে সে ক্ষমা চাইল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্বেও যদি তুমি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।”

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, “সুরসেন শান্তিসেনের অর্ধেক রাজত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেননি। শান্তিসেন যে কতবড় দাতা তা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঝোঁকের মাথায় শান্তিসেন যা বললেন তাতে সুরসেন দুই দেশের রাজাও হতে পারতেন। আবার হাতের মুঠোয় পেয়ে সুরসেনকে মেরে ফেলে শান্তিসেনও উভয় দেশের রাজা হতে পারতেন। এই ঘটনার ফলে পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে চিনতে পারলেন। তাই উভয় দেশের মধ্যে সাঁকো আবার তৈরি করার উদ্যোগ দেখা দিল।”

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

গরিবের কথা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবের বেতাল বলল, "রাজা, তুমি মনে করোনা যে একমাত্র সাধনা এবং তপস্যার মাধ্যমেই বিরাট শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। যে শক্তি পাওয়ার জন্য তুমি এত চেষ্টা করছ তা একজন সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে। আমি এমন এক গরিবের কাহিনী শোনাব যার ফলে আমার বক্তব্য তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে, আর শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পরিশ্রমও লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

কোন এক গ্রামে একজন গরিব ছিল।

বেতাল কথা
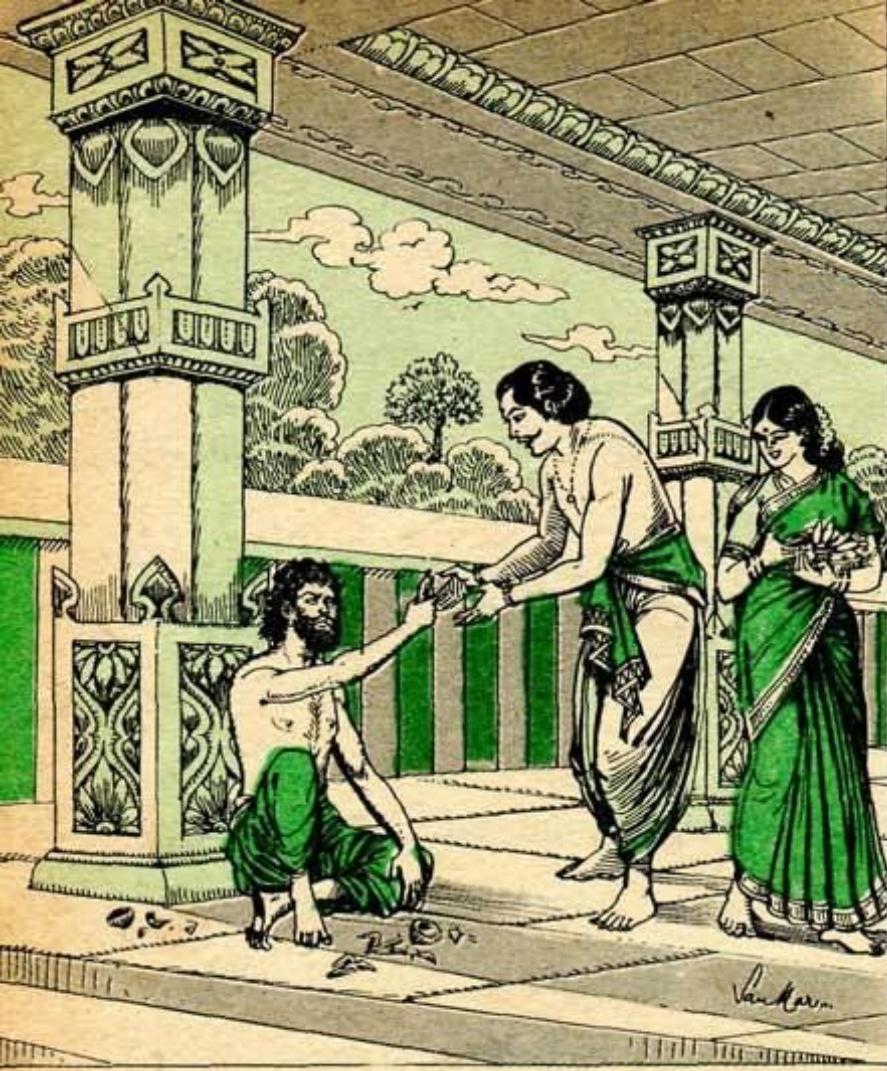
তার কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। সে প্রত্যেক দিন ঐ গ্রামের একটি পুকুরে চান করে শিব মন্দিরে ঢুকত। যে সব ভক্ত মন্দিরে আসত, পূজো দিত, তারা তাকেও দু একটি ফল খেতে দিত। কেউ কেউ পয়সাও দিত। যেদিন যা পেত তাই ঐ গরিব লোকটা খেত। যেদিন পেত না সেদিন খেত না। সে না খেয়েও সেখানেই পড়ে থাকত। অন্য কোথাও সে যেতো না।

একদিন এক লক্ষপতি বউকে নিয়ে শিব মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল। তার কোন ছেলে মেয়ে ছিল না।

সে পূজো দিয়ে ফেরার সময় তার সামনে একটি কলা ফেলে দিয়েছিল। কলাটি তুলে নিয়ে লক্ষপতিকে ফেরত দিতে দিতে ঐ গরিব লোকটা বলল, "এই কলা তোমার বউকে খেতে দাও। এক বছরের মধ্যে তার একটি ছেলে হবে।"

যার যা থাকে না তার জন্য তার দুঃখ থাকে বেশি। যে যা চায় সে তা পায় না। লক্ষপতি সন্তান চায় কিন্তু সে তা পায় নি।

লক্ষপতির সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। সে বউকে কলা খেতে দিল। এক বছরের মধ্যে লক্ষপতির বউ একটি ছেলের মা হল। লক্ষপতি ভাবল, গরিব লোকটা সাধারণ লোক নয়। অসীম ক্ষমতার অধিকারী সে। এই কথা ভেবে সে ঐ গরিব লোকটার কাছে গেল। তাকে দেখে গরিব লোকটা বলল, "কি ছেলে রাতদিন কাঁদছে বুঝি?"

লক্ষপতি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, "আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। আপনার ক্ষমতা অসীম। আপনার আশীর্বাদে আমি ধন্য হয়েছি। আপনি যা চাইবেন আমি তাই দেব। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু নিলে আমি ধন্য হব। বলুন, আমি আপনাকে কি দিয়ে ধন্য হতে পারি।"

লক্ষপতি বার বার অনুরোধ করা সত্বেও গরিব লোকটা একটি কথাও প্রথমে বলল না। অনেকক্ষণ ধরে একই কথা বলতে থাকায় গরিব লোকটা মুখ খুলল।

"আমার কোন কিছুর দরকার নেই। তবে তুমি একটু ভাল হও। গরিবদের বড্ড ঠকাচ্ছ। চুরি-চামারি করে বড্ড বেশি লাভ করছ। এত লাভ করোনা। পাপ বেড়ে যাবে। তোমার অপকর্মের জন্যে তোমার ছেলের অমঙ্গল হবে।"

লক্ষপতি সেদিন থেকে গরিবদের ঠকানো বন্ধ করে দিল। যার ত জিনিস বন্ধক রেখেছিল সব ফেরত দিল। তারপর থেকে সাধারণ ছোট খাট ব্যবসা করে সে দিন যাপন করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল "রাজা, গরিব লোকটার কথা খেটে গেল কি করে? ওর কথায় এত শক্তি এল কোথেকে? শুধু শিব ঠাকুরের প্রসাদের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করলেই কি এতটা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এই প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "গরিব লোকটার প্রত্যেকটি কথা যদি ফলে যেত তাহলে গাঁয়ের লোক হয়ত অনেক দিন আগেই তাকে মাথায় করে রাখত। কোন কোন কথা মাঝে মাঝে ফলে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অনেক তীর্থ ঘুরে যা হয়নি গরিব লোকটার দেওয়া কলা খেয়ে যখন সন্তান হল তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হয়েছিল লক্ষপতির।

বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

ঋণ মুক্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, জানিনা, জীবনের উপর বিরক্তি জাগার ফলে হয়ত তুমি এভাবে এতটা পরিশ্রম করছ। তবু আমি যতটা জানি বিরক্ত হয়ে অনেক সময় মরতে চাইলেও মৃত্যু আসে না। আমার কাহিনীর প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে গোপালের কাহিনী শোনাব। আমার এই কাহিনী শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমবে।" এই কথা বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল :

মহান্তিপুরে গোপাল নামে এক গরিব লোক নিরুপায় হয়ে ভিক্ষে করে দিন

বেতাল কথা

কাটাত। লোকটা এমন হতভাগা যে একবেলা খেতে পেলে তিন বেলা উপোস করতে বাধ্য হত।

একদিন রামানন্দ নামে এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিত শিষ্যদের নিয়ে কাশী যাওয়ার পথে মহাস্তিপুরে পৌঁছাল। অতবড় পণ্ডিতকে নিজেদের গাঁয়ে পেয়ে প্রত্যেকে তাকে সুখদুঃখের কথা বলল এবং কিভাবে যে তারা নিজেদের সীমাহীন দুঃখ দূর করবে তা জানতে চাইল।

পাড়ার সবাই যখন ঐ পণ্ডিতের কাছে তখন গোপাল আর স্থির থাকতে পারল না। সেও গিয়ে নিজের খেতে না পাওয়ার, দুঃখের দিনগুলোর কথা সবিস্তারে পণ্ডিতকে জানাল। সব কথা জানানোর পরে এর প্রতিকার কি ভাবে হবে তাও গোপাল জানতে চাইল।

"জীবনে তোমার দুঃখ দারিদ্র্য দূর হবে না।" রামানন্দ পণ্ডিত বলল।

"প্রভু, তাহলে আমাকে বলে দিন কিভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি।"

পাশের শহরে রামসাহা, ভীমসাহা ও সোমনাথ সাহা নামে তিনজন ব্যবসায়ী আছে। এই তিনজন তোমার কাছে ঋণী। প্রত্যেকের কাছ থেকে তুমি একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবে। এই ঋণ ওরা শোধ করার পরে তোমার মৃত্যু হতে পারে।" রামানন্দ পণ্ডিত বলল।

গোপাল রামানন্দ পণ্ডিতের কথা শুনে তাকে প্রণাম করে চলে গেল পাশের শহরে। গিয়ে ঐ তিনজনের সঙ্গে দেখা করল। গোপাল প্রত্যেককে একটা করে সোনার মুদ্রা দিতে বলল। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেকে গোপালকে একটি করে সোনার মুদ্রা দিয়ে দিল।

গোপাল ঐ তিনটি সোনার মুদ্রা খরচ করে গরিবদের খাইয়ে দিয়ে ভাবল, "সত্যি আজ আমি মুক্তি পাব। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে সে কি বলব। যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। বনে গিয়ে মরাই ভাল। কারণ বনে মরে গেলে যেকোন জন্তু জানোয়ার মহানন্দে পেটপুরে আমাকে খাবে।

সে গভীর বনে গেল। দুদিন ধরে সেখানে পড়ে রইল। দুদিনেও তার মৃত্যু না হওয়ায় সে অবাক হল। বনের বাঘ বা সিংহ এসে তাকে খেল না। অতবড় পণ্ডিতের কথা কেন যে ফলছে না তা সে ভেবে পেল না। সে টলতে টলতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে একটি গর্তে পড়ে গেল।

"যাক, স্বয়ং ভগবান তাহলে আমার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছেন। আর দেরী নেই, এই গর্তেই আমার মৃত্যু হবে।" ভাবতে ভাবতে গোপাল এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তার চোখে পড়ল

চকচকে একটি জিনিস। হাতে তুলে নিয়েই গোপাল বুঝতে পারল ওটা সোনা। তারপর সে যত তুলল তত সোনা পেল। যত সোনা পারল তুলে গোপাল বাড়ি ফিরল। সেই সোনা দিয়ে চাল ডাল নুন তেল কিনে সে গরিবদের খাওয়াতে লাগল। গোপাল কোত্থেকে যে অত সোনা পেল তা সে কাউকে জানাল না, কেউ তাকে সে প্রশ্নও করল না।

মোট কথা পণ্ডিতের কথা ফলেনি। অত সোনা পেয়েও সে অহঙ্কারী হয়নি, সে গরিবদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই জন্য সোনা সে সোনা খরচ করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, গোপাল মরল না কেন? অতবড় পণ্ডিতের কথার কি দাম নেই? একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল অতবড় পণ্ডিতের কথা? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "রামানন্দ পণ্ডিতের কথা মিথ্যা হয়নি। কারণ গোপাল ঐ তিনজন ব্যবসায়ীর কাছে যা পেয়েছিল তার অনেকগুলো গরিবদের দিয়ে ওদের ঋণী করে রাখল। যে তিনটি সোনার মুদ্রা পেয়েছিল সেগুলো খরচ করে সে যদি নিজের পেট পূরণ করত তাহলে হয়ত তার মৃত্যু হত। কিন্তু সে দান করত বলেই যেভাবে যা ঘটার ছিল তা ঘটেনি। মৃত্যুর পরে ওর দেহ যাতে জন্তুরা খায় তার জন্য সে বনে গেল। নিজেকে নিঃশেষে অন্যের স্বার্থে লাগানোর এই ইচ্ছার জন্যই সে গর্তে পেল অত সোনা। ফলে তার ঋণীদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল।"

রাজার এই ভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
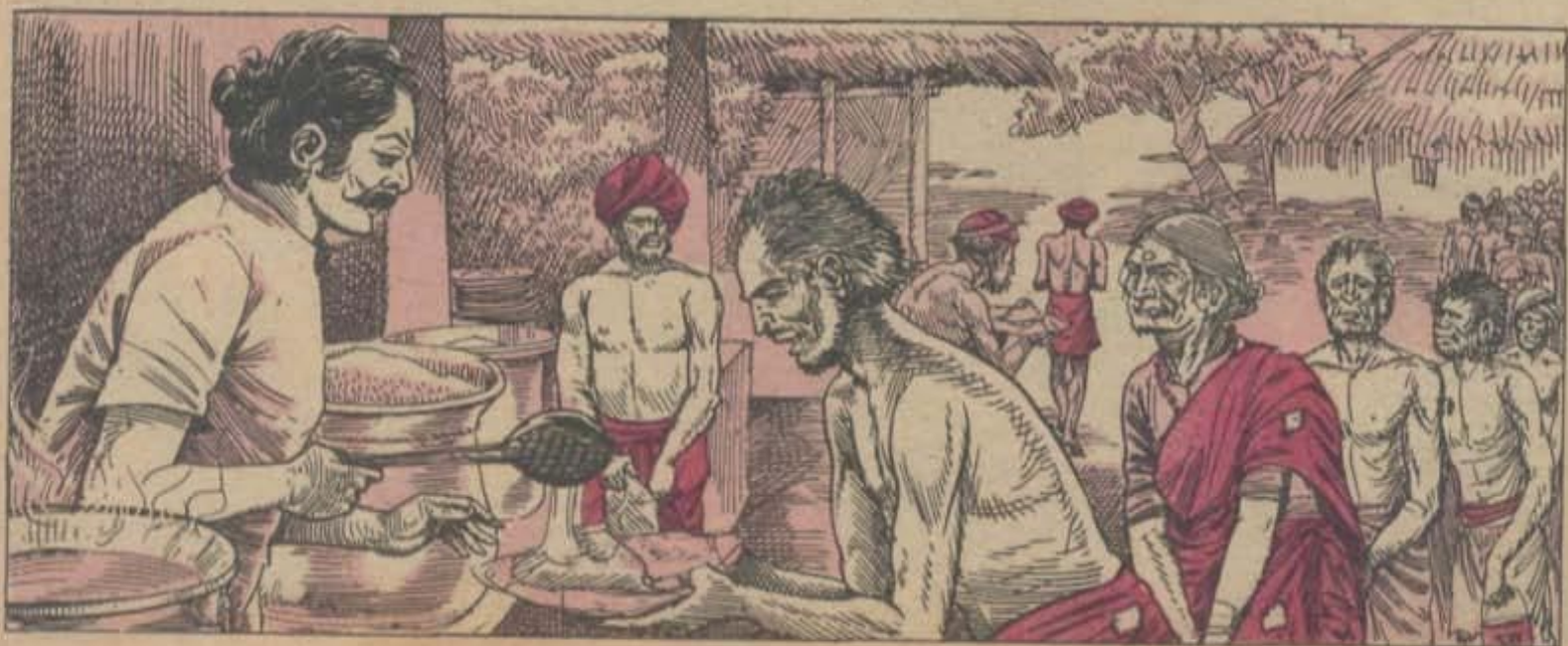
প্রতিজ্ঞা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য আবার গাছের কাছে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতই যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি হয়ত তোমার কোন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য এত পরিশ্রম করছ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না। আমার এই কথার নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে একটি সুন্দর কাহিনী বলছি। এই কাহিনী শুনলে তোমার ভাল লাগবে ও পথ চলার পরিশ্রম কমবে।" এই কথা বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে মালবদেশ ও পঞ্চাল

দেশের মধ্যে একবার প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দিল। মালবদেশের রাজার নাম ছিল বীরসেন। তার ছেলের নাম ছিল বিজয়সিংহ। পঞ্চালদেশের রাজার নাম ছিল বিমলাদিত্য। ঐ রাজার একটি মেয়ে ছিল। নাম মণিমালা। সে খুব সুন্দরী ও নম্রস্বভাবা ছিল। যথাসময়ে মণিমালার জন্য পাত্র বাছাই করতে স্বয়ম্বর সভা ডাকা হল। বিভিন্ন দেশে খবর পাঠানো হল। সুন্দরী মণিমালাকে বিয়ে করার আশায় বহু যুবক, এমনকি বহু দেশের বহু বয়স্ক রাজাও মণিমালার স্বয়ম্বর সভায় এসে হাজির হল।

তবে বিমলাদিত্য তার শত্রু বীরসেনের কাছে মণিমালার এই স্বয়ম্বর সভার কোন খবর বা আমন্ত্রণ পাঠায়নি। এতে বীরসেনের ভীষণ রাগ হল। এদিকে বীরসেনের ভীষণ আগ্রহ ছিল মণিমালাকে যেন তেন প্রকারেণ নিজের কবলে আনার।

বীরসেন তার ছেলে বিজয়সিংহকে ডেকে বলল, "তুমি এক্ষুণি তৈরি হও। তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। তুমি একাই পারবে। সৈন্য নিয়ে পঞ্চালদেশ আক্রমণ করে রাজকুমারী মণিমালাকে তুলে নিয়ে এস। হ্যাঁ—শোন, আমি স্থির করেছি মণিমালাকে বিয়ে করব।"

বিজয়সিংহ পঞ্চালদেশ আক্রমণ করে জয়ী হল। পরাজিত বিমলাদিত্য পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। রাজবাড়ির সবাই বিজয়-সিংহের হাতে বন্দী হল। বিজয়সিংহের নির্দেশে মণিমালাকে সসম্মানে তার সামনে হাজির করা হল। বিজয়সিংহকে দেখে মণিমালা চোখ ফেরাতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সংযত করে বিজয়সিংহ বলল, "রাজকুমারী, আপনাকে বিয়ে করতে আমার বাবা আগ্রহী। তাই আগামী কাল আমাদের দেশে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন।"

মণিমালা বিজয়সিংহের এই কথার

জবাবে কোন কথা না বলে বিজয়সিংহের কথা শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে গেল।

সেই রাত্রে বিজয়সিংহের ঘুম হল না। সারাক্ষণ তার চোখের সামনে মণিমালার মুখ ভাসতে লাগল। সে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করছিল। হঠাৎ মণিমালার এক চাকর একটি চিঠি এনে তার হাতে দিল। সেই চিঠিতে লেখা ছিলঃ "যুদ্ধ করে বীরের মত যে বস্তু জয় করা হয় তা অন্যের হাতে দিয়ে দেওয়া একান্ত অনুচিত।"

বিজয়সিংহ বুঝতে পারল মণিমালা তাকে বিয়ে করতে চায়। প্রথম দর্শনেই মণিমালাকে তার ভাল লেগেছে। তার ওপর এই চিঠি পেয়ে বিজয়সিংহ ঠিক করল মণিমালাকে সে-ই বিয়ে করবে। পরের দিন মণিমালাকে নিয়ে মালব দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। বহু সময় ধরে ভেবে ভেবে অবশেষে সেদিনই বিজয়সিংহ মণিমালাকে বিয়ে করল।

সেই রাত্রে সে মণিমালাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে মহানন্দে তাকে কাছে টানতে যেতেই তার বুকে একটি ছোরা ঠেকে গেল। মণিমালা ছোরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। বিজয়সিংহ তাকে আলিঙ্গন করতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছোরা চালাতে গেল। বিজয়সিংহ ঝট্ করে তার

হাত ধরে বেঁকিয়ে তাকে প্রশ্ন করল, "আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে তাতে আমার মনে হয়েছিল তুমি আমায় ভালবাস; তুমি কি ভালবাসার অভিনয় করেছিলে? সত্যি বল, তা না হলে তুমি আমার হাতেই কঠোর শাস্তি পাবে।"

"যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাবা আমাকে শেষ কথা বলেছিলেন প্রতিশোধ নিতে। আমি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।"

বিজয়সিংহ কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে, কর্তব্য স্থির করে ও হঠাৎ কোথায় যেন চলে গেল। তারপর থেকে তার খোঁজ আর কেউ কোনদিনই পেল না।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, মণিমালাকে বিজয়সিংহও তো ভালবেসেছিল, তাকে ছেড়ে সে চলে গেল কেন? সে কি মণিমালাকে ক্ষমা করতে পারেনি? মণিমালা তো বলেছিল তার ভালবাসা অভিনয় নয়। তবু তার কথা কি বিজয়সিংহের বিশ্বাস হল না? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "মণিমালাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বিজয়সিংহকে দোষ দেওয়া যায় না। মণিমালার ছোরা তার বুকে বিদ্ধ হলে সে মারা যেত, মণিমালা একাই পড়ে থাকত। ওর চলে যাওয়ার কারণ অন্য। সে মণিমালার কাছে একটি শিক্ষা পেয়েছিল। মণিমালা বিজয়সিংহকে ভালবেসেও বাপের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে মণিমালাকে ভালবেসে বাপের ইচ্ছার কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই সে নিজের দেশে না ফিরে অন্য দেশে পাড়ি দিল।"

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
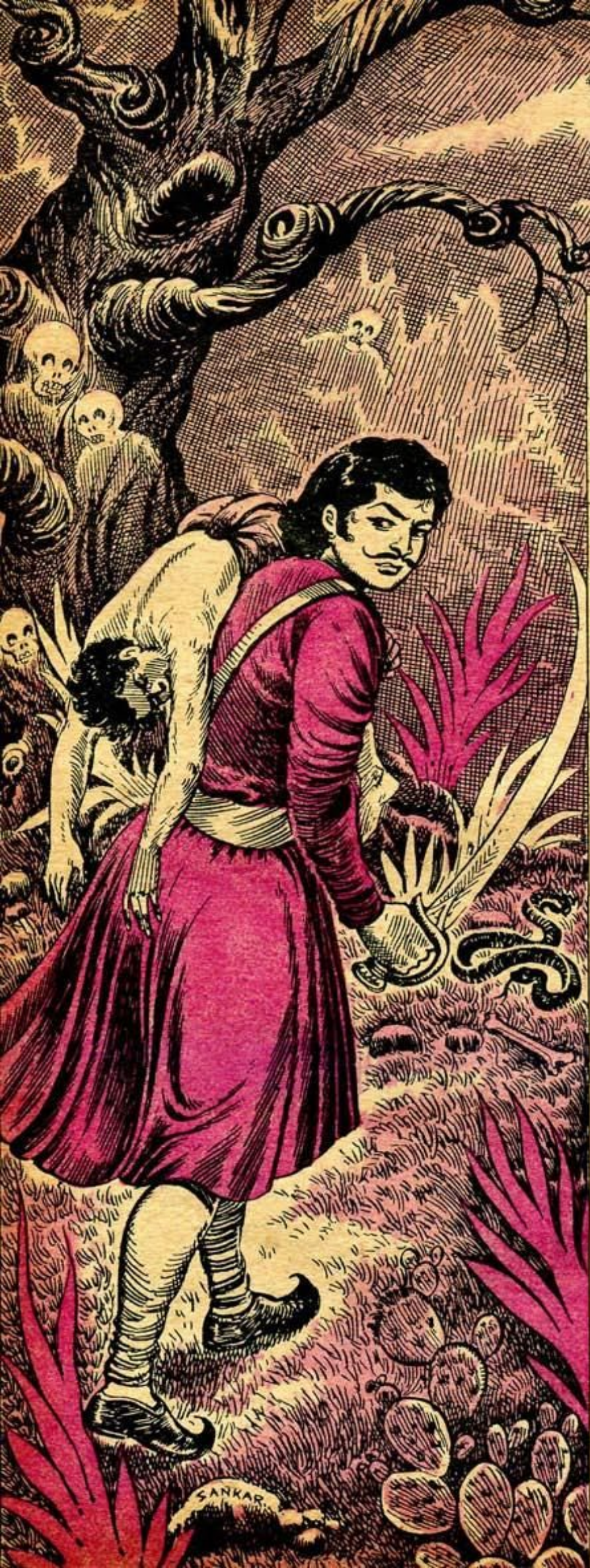
অনুভবানন্দ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শব থেকে বেতাল বলল, "রাজা, বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্বেও তুমি যে বিরক্ত হচ্ছ না তাতে আমি অবাক হচ্ছি। ভাগ্য বিরূপ হলে অনেকে বিফল মনে, হতাশ হয়ে অরণ্যের দিকে পাড়ি দেয়। আমার কথার প্রমাণস্বরূপ তোমাকে আমি ধনগুপ্তের কাহিনী শোনাব। সেই কাহিনী শুনে তোমার খুব ভাল লাগবে এবং তোমার পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল :

ধনগুপ্ত ছিল এক ব্যবসাদারের ছেলে। বাপের অনেক সম্পত্তি সে পেয়েছিল।

বেতাল কথা

তার ঝোঁক ছিল ভোগবিলাসের দিকে। কিন্তু ব্যবসা এমন একটা জিনিস যা করতে হলে ভোগবিলাসে গা ভাসানোর সময় তেমন থাকে না। ফলে ধনগুপ্তের কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্তি জাগল। সে ভাবল, অত কষ্ট করে ব্যবসা না করে জুয়ো খেলে টাকা রোজগার করবে। ধনগুপ্ত আস্তে আস্তে ব্যবসা ছেড়ে চুটিয়ে জুয়ো খেলা শুরু করল। খেলতে খেলতে সে যেমন মোটা টাকা হারত আবার তেমনি জিততও। কিছুদিন এইভাবে চলার পর একদিন সে হঠাৎ সমস্ত ধনসম্পত্তি খুইয়ে রাস্তার ভিখারী হল।

এই ঘটনার ফলে ধনগুপ্তের মনে জীবনের প্রতি বিরক্তি জাগল। তার আর ইচ্ছা করল না সমাজে বাস করতে। সে হিংস্র জন্তুর কথা ভেবেও, জীবনের মায়া ছেড়ে অরণ্যের দিকে পা বাড়াল। কিছুকাল পরে তার চুল দাড়ি বেড়ে গেল. চুলে জট ধরল। তাকে তখন ঠিক একটা পাগলের মত দেখাচ্ছিল।

একদিন ধনগুপ্ত কাউকে কিছু না বলে একবস্ত্রে বাড়ীঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সে ভাবল : যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই যাবে। এইভাবে অত সম্পদ হারিয়ে, ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার যে খারাপ লাগছিলনা তা নয়, তবে বন্ধনহীন মুক্ত জীবনও কম আকর্ষণীয় নয়। এবং সেই আকর্ষণেই ধনগুপ্ত এত সহজে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারল। এইভাবে বহুদূর গিয়ে সে বিরাট অরণ্যের প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

অদূরে বহু অরণ্যবাসী ছিল। সে বছর ফসল না হওয়ায় ওরা দূরে দূরে গিয়ে শিকারে লাগল। হঠাৎ ওদের নজর পড়ল ধনগুপ্তের ওপর। তার বিরাট বিরাট দাড়ি গোঁফ দেখে তারা অবাক হল। তারা আরও অবাক হল এই দেখে যে ধনগুপ্তের কাছে কোন অস্ত্র নেই। যে বনে এত বাঘ

ভালুক সেখানে নিরস্ত্র মানুষকে দেখে ওদের অবাক হওয়ারই কথা। ওরা ভাবল এ মানুষ নয়, দেবতা নিশ্চয়। ওরা তার পায়ে পড়ে প্রণাম করল। তখন ওদের দিকে তাকিয়ে ধনগুপ্ত হাসি হাসি মুখে বলল, "কি চাও তোমরা?"

"আপনি আমাদের আস্তানায় এলে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে।" ওরা বলল।

কথা না বাড়িয়ে ধনগুপ্ত ওদের ডেরায় চলে গেল। ধনগুপ্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিন বাদে মুষলধারে বৃষ্টি হল।

অরণ্যবাসীরা ভাবল, এটা ধনগুপ্তের মাহাত্ম্যের ফলে হয়েছে। ভাল বৃষ্টি হওয়ায় সে বছর সমস্ত এলাকায় ভাল ফসল হয়েছিল। তার ফলে অরণ্যবাসীদের ঘরে ঘরে আনন্দ দেখা দিল।

সে দেশের রাজার সঙ্গে অরণ্যবাসীদের বিবাদ ছিল। ওদের সবসময় রাজা দাবিয়ে রাখতেন। রাজার কানে গেল যে অরণ্যবাসীদের অবস্থা ভাল হচ্ছে। তিনি তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য বিরাট এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। এদিকে অরণ্য-বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা যেহেতু একজন মহাপুরুষকে তাদের কাছে পেয়ে গেছে সেহেতু তারা হেরে যেতে পারে না। তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজার সেনাবাহিনীকে তারা হঠিয়ে দিল।

রাজার সেনাবাহিনী হেরে যাওয়ায়

রাজা খুব অবাক হলেন। তিনি কারণ জানতে গুপ্তচর পাঠালেন। গুপ্তচর ফিরে এসে মহাপুরুষের আগমনের কথা জানাল। শুনে রাজারও বিশ্বাস হল যে নিশ্চয় কোন মহাশক্তি অরণ্যবাসীকে সাহায্য করছে। তাই তিনি ভাবলেন, অরণ্যবাসীকে জব্দ করার আগে ঐ মহাপুরুষকে লাভ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে। রাজা গোপনে ধনগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে তাঁর রাজ্যে আসার আহ্বান জানালেন।

ধনগুপ্ত ভাবল যে ঐ অরণ্যে থাকার চেয়ে রাজার অধীনে থাকলে তার অনেক উন্নতি হবে। তাই সে অরণ্যবাসীদের না জানিয়ে সোজা রাজার কাছে চলে গেল।

রাজা সাদরে তাকে গ্রহণ করে তার নাম জানতে চাইলেন। জবাবে ধনগুপ্ত বলল, "আমার নাম অনুভবানন্দস্বামী।"

ধনগুপ্তের এই রাজার কাছে আসার দু-একদিনের মধ্যেই তাঁর একটি কঠিন রোগ সেরে গেল। রাজা যথারীতি রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যদের প্রশংসা করলেও মনে মনে তিনি বুঝেছিলেন যে এ নিশ্চয় এই মহাপুরুষ অনুভবানন্দের মহিমা।

রাজা তাঁর অনুভবানন্দের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করালেন। দেখতে দেখতে রাজার কাছাকাছি যারা থাকে তারাও অনুভবানন্দের ভক্ত হয়ে গেল। ধনগুপ্ত অবস্থা বুঝে দুচারটি করে কথা বলত। রাজধানীর মত ধনবহুল স্থানে অনুভবানন্দ হয়ে থাকা যে কত কষ্টকর তা সে কিছুদিনের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেল।

কিছুদিন পরে ঐ রাজার সঙ্গে ধনগুপ্তের দেশের রাজার বিরোধ বাধল। রাজা যুদ্ধে যাওয়ার আগে ধনগুপ্তের কাছে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। ধনগুপ্ত বাধ্য হয়ে বলল, "বিজয়োস্তু।" এইভাবে নিজের দেশের পরাজয় কামনা করে ধনগুপ্ত মনে মনে দগ্ধ হল। কিন্তু তখন এ ছাড়া আর তার করার কিছু ছিল না।

রাজা যুদ্ধে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলেন। ফেরার পথেই রাজা ঠিক করলেন : এবার অনুভবানন্দস্বামীর আশ্রম বড় করব। আরও ঘটা করে তার পূজো দেব। কিন্তু ফিরে এসে রাজা আর অনুভবানন্দস্বামীর দর্শন পেলেন না। তারপর আর কেউ কোনদিন এই অনুভবানন্দকে দেখেনি।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, অরণ্যবাসীর নজরে পড়ার পর ধনগুপ্তের মনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জীবনের প্রতি তার যে বিরক্তি জেগেছিল সেটাও লোপ পেয়েছিল। কিন্তু আবার সে সংসারে ঝামেলায় কেন গেল? নিজের দেশকে যে রাজা পরাজিত করেছে তার কাছ থেকে সে কি প্রশংসা পেতে চায়নি? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তুমি না দাও তাহলে জেনে রাখ তোমার মাথা এক্ষুণি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

রাজা বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, "ধনগুপ্ত জানত নিজের দেশ ও নিজের দেশের রাজাকে। সে বুঝেছিল যে তার দেশ হেরে যাবে। তার নিজের যে তেমন কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই, তাও সে জানত। অত ক্ষমতা তার থাকলে সে জুয়ো খেলায় ধনসম্পত্তি হারাত না। তবু তার নিজের দেশের পরাজয়ের জন্য রাজাকে সে আশীর্বাদ করল। এতে সে মনে মনে খুবই দুঃখ পেল। আর তাছাড়া একটি ভয় ছিল তার সবসময়। তা হল তার যে তেমন কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই তা যে কোন মুহূর্তে লোকের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। এই ভয়ে এবং ঐ দুঃখে সে রাজধানীর সুখ ছেড়ে একদিন বনপথে হারিয়ে গেল।"

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
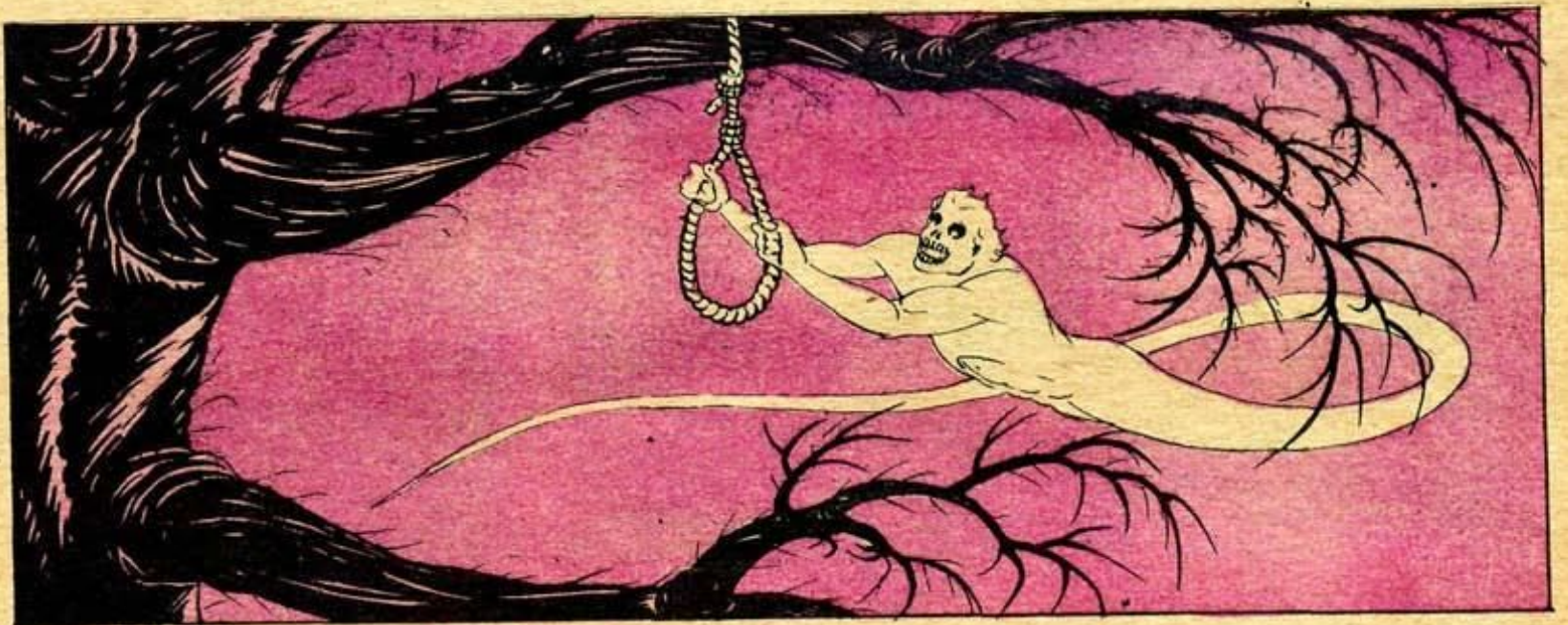
নাস্তিকের দৈবভক্তি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি নীরবে। তখন শব থেকে বেতাল বলল, "রাজা, একজন মানুষ আস্তিক অথবা নাস্তিক হতে পারে। কিন্তু আমি একজনের কাহিনী বলব যে দুটোই ছিল। কাহিনীটি শুনলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।" বলে বেতাল তার কাহিনী শুরু করল :

কোন এক দেশে রামেশ্বর নামে একজন লোক ছিল। গরিবদের সে খুব সাহায্য করত। গরিবের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদত। তবে তার ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তি ছিল না। কোন মন্দিরে সে ঢুকত না। সে ছিল নাস্তিক। তার ধারণা

বেতাল কথা
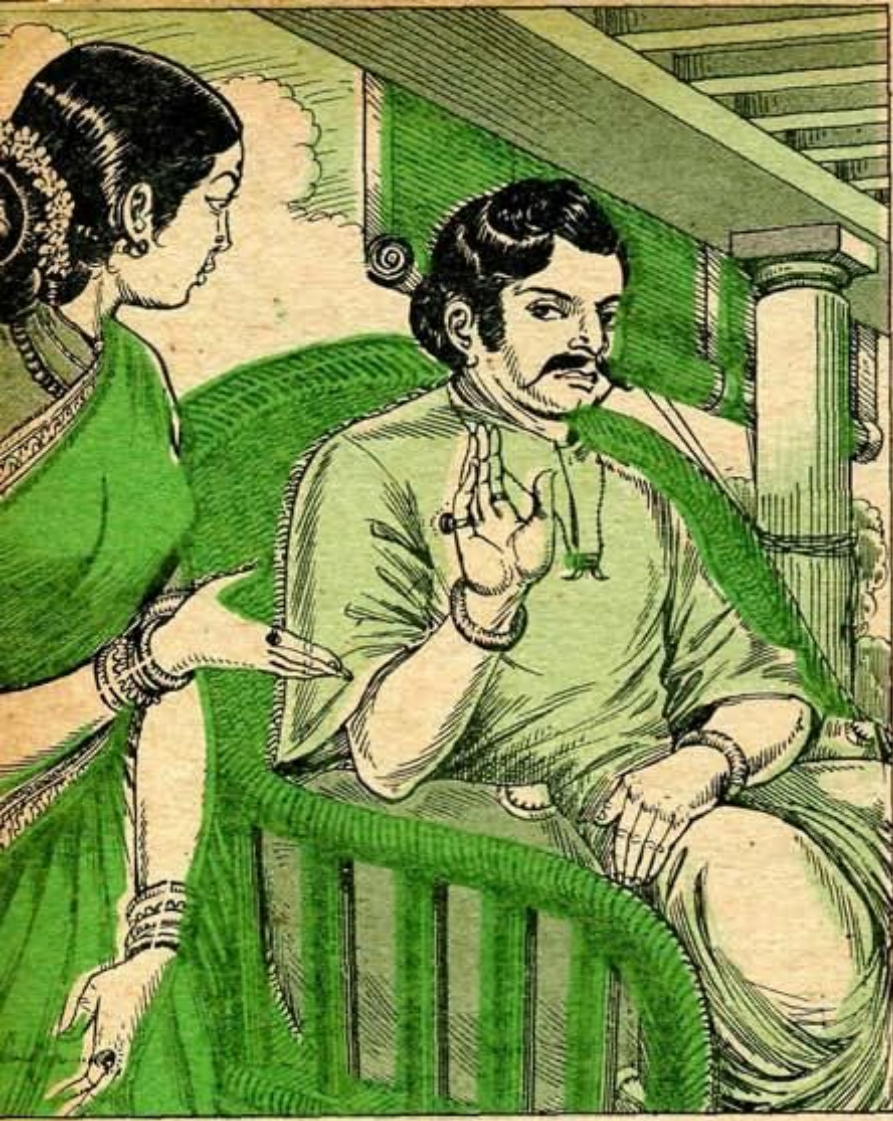
ছিল অসহায় মানুষকে সেবা করার চেয়ে ইহজগতে বড় ধর্ম আর কিছু নেই।

একবার রামেশ্বরের মেজ ছেলের কঠিন অসুখ করল। তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নগরের বড় বড় বৈদ্য এসেও রামেশ্বরকে ভরসা দিতে পারল না। তার ঐ বিপদের সময়ে বন্ধু আত্মীয়স্বজনরা তাকে বলল, "যেহেতু তুমি নাস্তিক সেইহেতু তোমাকে ভগবান পরীক্ষা করে দেখছেন। ভাল চাও তো প্রায়শ্চিত্ত কর। ঠাকুরের নামে মানত কর।"

"আমি নাস্তিক হয়ে ভগবান অথবা মানুষের ক্ষতি করিনি। নাস্তিক বলে যদি ঠাকুর আমাকে শাস্তি দিতে চান তাহলে তিনি কি ধরণের ঠাকুর! যা ঘটে ঘটুক, আমি কোন দেবতার নামে মানত করব না।" রামেশ্বর পরিষ্কার বলল।

রামেশ্বরের স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে একহাজার এক টাকা খরচ করে পূজো দেওয়ার মানত করল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। কিছুদিন পরে ঠাকুরদেবতার উপর রামেশ্বরের স্ত্রীরও বিশ্বাস কমে গেল।

কিছুদিন পরে সেই গ্রামে এক মহাপুরুষ এল। চারদিকে রটে গেল ঐ মহাপুরুষের ক্ষমতা অসীম। তার হাতের ছোয়া পেলে অন্ধ লোক আলো দেখতে পায়, যে কোন কঠিন অসুখ সে নাকি সারিয়ে দিতে পারে। রামেশ্বরের স্ত্রী স্বামীকে বলল, "কে নাকি মহাপুরুষ এসেছেন, ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালে হত না? উনি নাকি দেবতা।"

"মানুষ আবার দেবতা হবে কি করে? আমি তো শুনেছি একটা সাধু এসেছে। সাধু যদি রোগ সারায় বৈদ্য করবে কি? এসবে আমার বিশ্বাস নেই।"

তারপর ছেলেকে নিয়ে রামেশ্বর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বহু নামকরা বৈদ্যকে দেখাল। কিন্তু কোন ফল হল না।

কিছুদিন পরে মহাবিষ নামে এক বৈদ্য

দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে রামেশ্বরদের গ্রামে এল। ঐ বৈদ্যের হাত দিয়ে নাকি নানা ধরণের রুগী সেরে উঠেছে। মহাবিষ গ্রামে ঢোকার পরের দিন থেকে চারদিকের লোক এসে ভেঙে পড়ল। রামেশ্বরও ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ঐ বৈদ্যকে দেখাল। ছেলেকে পরীক্ষা করে মহাবিষ তিনটি পুরিয়া দিল। দিনে একটি করে খেতে হবে।

একপুরিয়া খাওয়ার পরেই ছেলের ঠোঁট নড়ে উঠল। মুখে ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। দ্বিতীয় পুরিয়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভালভাবেই কথা বলতে পারল। তৃতীয় পুরিয়া খাওয়ানোর পর রামেশ্বর মহাবিষের কাছে গিয়ে বলল, "প্রভু, আপনি অসামান্য বৈদ্য। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এতদিন আপনার সন্ধান পাইনি।"

মহাবিষ হেসে বলল, "আমার কাছে নানা ধরণের ওষুধ আছে। রোগ যদি সেরে থাকে ওষুধের জন্যই সেরেছে। অন্য কোন কারণে নয়। সাধারণ রোগ যে কোন বৈদ্য সারাতে পারে। কিন্তু আমার কাছে বহু কঠিন কঠিন রোগ সারানোর ওষুধ থাকায় আমি দেশে দেশে ঘুরি। ওষুধ খেয়ে সেরে ওঠার পর যে যা আমাকে দেয় আমি তাই নিই।"

রামেশ্বর তার হাতে একহাজার টাকা

দিয়ে তার পায়ে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, এতদিন ভেবেছিলাম ভগবান নেই কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপনিই ভগবান।"

মহাবিষ রামেশ্বরকে হাত দিয়ে ধরে তুলে বলল, "দেবতার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই? তুমি হয়ত প্রত্যক্ষ দৈবস্বামীর দর্শন পাওনি। তাঁর দর্শন পেলে দেবতার উপর তোমার বিশ্বাস জাগত। আমি তাঁর ভক্ত। তাঁর নির্দেশেই আমি দেশে দেশে ঘুরে রুগীদের দেখি। পারলে একবার তুমি তাঁর দর্শন করে এস।"

মহাবিষ যেহেতু বলল সেহেতু কথাটা যেন রামেশ্বরের মনে গেঁথে গেল। সে

প্রত্যক্ষ দৈবস্বামী দর্শন করে এল। ফেরার পর স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে রামেশ্বর বলল, "ওঁকে দেখে তো এমন কিছু মনে হল না। লোকে যে তাঁকে কেন ভগবান মনে করে বুঝতে পারিনা। আমার কাছে মহাবিষই হল সাক্ষাৎ দেবতা।"

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, এখন তুমিই বল, রামেশ্বরকে কি বলা যায়? নাস্তিক না আস্তিক? যে লোকটা কোনদিন মন্দিরে ঢোকেনি সে মহাবিষের মধ্যে দেবতার সন্ধান পেল কি করে? মহাবিষ যাঁর শিষ্য তাঁর মধ্যে সে দেবতার সন্ধান পেল না কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

রাজা বিক্রমাদিত্য এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, "ভগবানের কোন আকার নেই। তিনি যে কখন কাকে কোন্‌রূপে দেখা দেবেন তা কেউ জানে না। বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত। একমতের লোক অন্য মতের মানুষকে নাস্তিক বলে। যাঁরা ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে তারা সবকিছুর জন্য ঠাকুরদেবতাকেই দায়ী করে। তা না করাতেই রামেশ্বর ওদের চোখে নাস্তিক হয়ে গেল। মহাবিষ রুগীদের রোগ সারানোই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে। নিজের ছেলে সেরে ওঠার পর মহাবিষের মধ্যে দেবতার দর্শন লাভ রামেশ্বরের পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি একজায়গায় বসে উপদেশ বিতরণ করেন তাঁর মধ্যে দেবতার সন্ধান পায়নি রামেশ্বর। তাকে দেখে রামেশ্বরের মনে হয়েছে তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তাই রামেশ্বরের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোন মত নেই। সে যা ছিল তাই রইল।"

বিক্রমাদিত্য রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

ঠাকুরের ইচ্ছা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, "রাজা, মানুষের চেষ্টার উপর তোমার গভীর বিশ্বাস আছে। আমি তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ভগবান যে কখন কোন্ কাজটা মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেন তা কেউ বলতে পারে না। আমার কথা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে একটি কাহিনী শুনলে। কাহিনীটি শুনলে আমার ধারণা পথচলার পরিশ্রমও কমবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

বসন্তদেশের রাজা ছিল নামকরা বীর। তার সিংহাসনে বসার কিছুদিনের মধ্যেই

বেতাল কথা

প্রতিবেশী দেশ হেমন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল। ঐ যুদ্ধে বসন্তদেশের রাজার জয় হল। ফলে সিংহাসনে বসতে না বসতেই বসন্তদেশের রাজা তুটি দেশের রাজা হয়ে গেলেন।

যুদ্ধে তুটো দেশেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল। লোকজন মারা গেল। ধনসম্পত্তি নষ্ট হল। রাজা ছিল মহাবীর। এত সহজে একটি দেশ জয় করে ফেলায় তার মনে আরও অনেক দেশ যুদ্ধ করে জয় করার ইচ্ছা জাগতে পারে। ফলে বহু প্রজা মারা যাবে। অগাধ ধনসম্পত্তি নষ্ট হবে। এই কথা ভেবে মন্ত্রী রাজজ্যোতিষীকে রাজার ঠিকুজীকোষ্ঠি দেখতে বলল।

"মহামন্ত্রী, আমাদের রাজা শুধুমাত্র তুটি দেশেরই রাজা হতে পারবেন। কোন কারণে আর একটি বার যদি তাকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় তখন কিন্তু তাকে তুটো দেশই হারাতে হবে।" জ্যোতিষী মন্ত্রীকে গোপনে জানাতে চাইলেও হঠাৎ রাজা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কথাগুলোও রাজার কানে গেল। শুনেই রাজা জ্যোতিষীকে বলল, "দেখ জ্যোতিষী বীরত্ব এমন একটা জিনিস যা দিনকে রাত করতে পারে।"

"মহারাজ, যে কোন যুদ্ধের জয় পরাজয় শুধু রাজার উপর নির্ভর করে না। সৈন্যরা যদি ঠিকমত না চলে, তাদের খাদ্য

যদি ঠিকসময় না পৌঁছায়, যুদ্ধে জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এছাড়া সবার উপরে আছে দেবতার আশীর্বাদ। আপনার ভাগ্যে দেবতার আশীর্বাদ বলতে যা বোঝায় তার কিছু নেই।" জ্যোতিষী সুচিন্তিত বক্তব্য বলার মত বলল।

"তুমি যা বললে আমি তা মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমি আরও একটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" রাজা বলল।

"মহারাজ, তার আগে বিভিন্ন দেশের বীরদের আপনার বিরুদ্ধে তরবারি যুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা যে কারও নেই আগে তা প্রমাণ হয়ে গেলে খুব ভাল হবে।"

রাজা তাই করল। বিভিন্ন দেশের বীরদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাল। বহু বীর এসে রাজার কাছে পরাজিত হল। যারা পরাজিত হত রাজা তাদের সসম্মানে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করত। বহু রাজা মনে মনে ভাবল, এত বড় বড় বীর আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এটাই আমার ভাগ্য।

এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। রাজজ্যোতিষীর ছোটভাই ছিল সমন্ত দেশের রাজজ্যোতিষী।

বসন্তদেশের রাজার কোন ছেলে ছিল না। অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। যেমন ছিল তার রূপ তেমনি ছিল তার

গুণ। প্রকৃতপক্ষে সেই বসন্তদেশ এবং হেমন্তদেশের উত্তরাধিকারিণী ছিল।

সমন্তদেশের রাজা ছিল যুবক। ঐ রাজকুমারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা সমন্ত দেশের রাজারও ছিল। সে ঐ কথা রাজজ্যোতিষীর কাছে গোপনে প্রকাশ করল।

রাজজ্যোতিষী ঠিকুজী দেখে বলল, "মহারাজ, আপনি তিনটি দেশের রাজা হবেন। এখন আপনি বসন্তদেশের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিতে পারেন যে আপনার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা যদি তিনি না করেন তাহলে আপনি তার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তারপর দেখা যাক কি হয়।"

সমন্তদেশের রাজা বসন্তদেশের রাজার কাছে জ্যোতিষীর কথামতই খবর পাঠাল। বসন্তদেশের রাজা তৎক্ষণাৎ সমন্তদেশের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বেতাল এই কাহিনী বলে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল "রাজা, বসন্তদেশের রাজার মত একজন বীর রাজা সমন্তদেশের রাজার ছোট্ট হুমকিতে এতটা ভয় পেয়ে গেল কেন? অন্যের হাতেই তো চলে গেল নিজের দুটো দেশ। না কি বসন্তদেশের রাজা নিজের বীরত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "বসন্তদেশের রাজার জ্যোতিষীর কথায় পুরো বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি জ্যোতিষীর কথামত চলেছেন। অন্য কোন দেশ জয় করার চেষ্টা করেননি। সমন্ত রাজার রাজজ্যোতিষী এই রহস্যটুকু ভালভাবেই জানত। সেইজন্যেই সে সমন্ত দেশের রাজাকে ঐ পরামর্শ দিয়েছিল।"

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল। [কল্পিত]

সাধুর বর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, কথায় বলে পাত্র বুঝে দান করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক সত্যবাদীর ভাগ্যেও দান জোটে না। উদাহরণস্বরূপ মণিগুপ্তের কাহিনী বলব। শুনলে পথ চলার শ্রম লাঘব হবে।" বেতাল কাহিনী শুরু করল:

প্রাচীনকালে এক সিদ্ধসাধু তার শিষ্যদের নিয়ে একটি নগরে এসেছি ন। সেই নগরে একজন ধনী ছিল। তার নাম মণিগুপ্ত। তাকে লোকে দাতাকর্ণ নামে অভিহিত করত। সাধু মণিগুপ্তের বাড়িতে গেল। ার আশা ছিল মণিগুপ্ত তাকে নিশ্চয়ই অতিথি হিসাবে গ্রহণ করবে।

বেতাল কথা

সাধু দেখল মণিগুপ্তের বাড়ির সামনে হাজার হাজার গরিব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার লোকজন তাদের দান দক্ষিণা দিচ্ছে। একদিন থাকার পর সাধু ফেরার আগে মণিগুপ্তকে বলল, "আমি তোমার অতিথিসেবায় মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে কোন বর চাইতে পার। তবে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে পরার্থে যদি বর চাও তবেই আমার সেই বরে তোমার কাজ হবে।"

মণিগুপ্ত সবিনয়ে প্রণাম করে সাধুকে বলল, "প্রভু, আপনি এমন বর দিন যাতে আমি সারাজীবন এভাবে দানধর্ম করে যেতে পারি।" সাধু মনে মনে হেসে মাথা নেড়ে বর দিয়ে শিষ্যসহ ফিরে গেল।

ফেরাপথে শিষ্য প্রশ্ন করল, "গুরুদেব, আপনি যে বর মণিগুপ্তকে দিয়েছেন তা কি ফলবতী হবে?"

মাথা নেড়ে সাধু বলল, "না।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে দেখা গেল মণিগুপ্তের সেই দানধর্ম করার ক্ষমতা নেই। সে তখন কোনরকমে কালযাপন করছে এতই খারাপ অবস্থা।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, সাধুর দেওয়া বর ফলল না কেন? সাধুর কি বর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "মণিগুপ্ত যদি পরার্থে বর চাইত তাহলে সে কামনা করত দেশের সবাই যাতে সুখে থাকে। কিন্তু সে দাতা হিসেবে অমর হয়ে থাকার জন্য বর চাইল। নিজের স্বার্থে চাওয়ায় সাধুর বর ফলবতী হল না।"

রাজা এই ভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

ভুলের কাছে ঋণী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি স্বার্থের জন্য এত পরিশ্রম করছ, না বিনাস্বার্থে তোমার এই পরিশ্রম আমি তা জানি না। তবে আমি একজনের কথা জানি সে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। তার নাম পর্বত। সে অচেনা অজানা লোককে এত সাহায্য করেছিল যে বলার নয়। তার কাহিনী শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমে যাবে। শোন বলছি।" এই বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে একটি গ্রামের শেষপ্রান্তে পর্বত নামে একটি গরীব লোক ছিল।

তার বউ আর সে একটি কুঁড়েঘরে থাকত। তার কুঁড়ের পাশে ছিল আর একটি ঘর। একদিন ঐ ঘরে ঢুকল এক বুড়ো। বুড়োর আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। বুড়ো অসুস্থ ছিল। এসব লক্ষ্য করে তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা জাগল পর্বতের মনে। কিন্তু ইচ্ছা জাগলেও পর্বতের ক্ষমতা ছিল না। সাহায্য করতে না পারায় পর্বত মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল।

তার মনের অবস্থা বুঝে তার বউ বলল, "এত মাথমুণ্ডু কি ভাবছ? বুড়োটার কপালে কষ্ট পাওয়া আছে তাই পাচ্ছে। কর্মফল বলে একটা জিনিস তো আছে। যে আজ বাদে কাল মরবে তাকে নিয়ে তোমায় এত ভাবতে হবে না।"

বউ যা বলল তার একটি কথাও মিথ্যা নয়। তবু বুড়োর কষ্ট দেখে পর্বতের বড় কষ্ট হয়। বুড়ো সারারাত কাশে। এক একদিন পর্বত ভাবে বুড়োটার গলা টিপে মেরে ফেললে কেমন হয়। এত কষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। ভাবে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। একদিন পর্বত ঘরের বাইরে একটি গাছের নিচে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেবে ঠিক করল। গাছের নিচে শুতে না শুতেই একটা বিরাট ছায়া ছায়া মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

"আমি ভূত।" বলল ঐ মূর্তি।

শুনে পর্বতের গোটা শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে অনেক কষ্টে বলল, "কি চাও তুমি?"

"তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই পোঁটলাতে টাকা আছে। এই টাকা ঐ বুড়োকে দিয়ে তাকে নগরে নিয়ে গিয়ে সারাতে হবে।" আমার কথা বুঝতে পেরেছ? ভূত বলল।

এমন পরোপকারী ভূতকে দেখে পর্বতের মন থেকে ভয় মুছে গেল। সে

ভূতের সঙ্গে কথা বলল, "এই বুড়োর উপর তোমার এত দয়া কেন? কোন জ্যান্ত লোক বুড়োকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে না আর তুমি কোন্ স্বার্থে তাকে টাকা দিচ্ছ?"

ভূত বলল, "এই বুড়োটা যে কত বড় ধনী লোক তা তুমি জান না। অবশ্য সে আজকের কথা নয়। অনেক দিন আগে এই বুড়োটা ধনী ছিল। দানধর্মও করত। আমি তখন এক লক্ষপতির বাড়িতে কাজ করতাম। আমার ঐ বাড়ির মালিক আমাকে দশহাজার টাকা দিয়ে নগর থেকে একটি জিনিস আনতে বলেছিল। আমি যাওয়ার সময় একটি ধর্মশালায় রাত কাটিয়েছিলাম। রাত্রে আমার সমস্ত টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার কথা আমার মালিক বিশ্বাস করেনি। বিচার হল। বিচারক আমাকে চোর বলে ঘোষণা করল। আমার ভীষণ দুঃখ হল। আমি সোজা গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলাম। কিন্তু সে যাত্রা মরতে পারলাম না। চারজন ধরে আমাকে বাঁচাল। তারপর সবাই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল আমার আত্মহত্যার কারণ। সবাই শুনত আমার দুঃখের কথা। কে কতটা বিশ্বাস করত
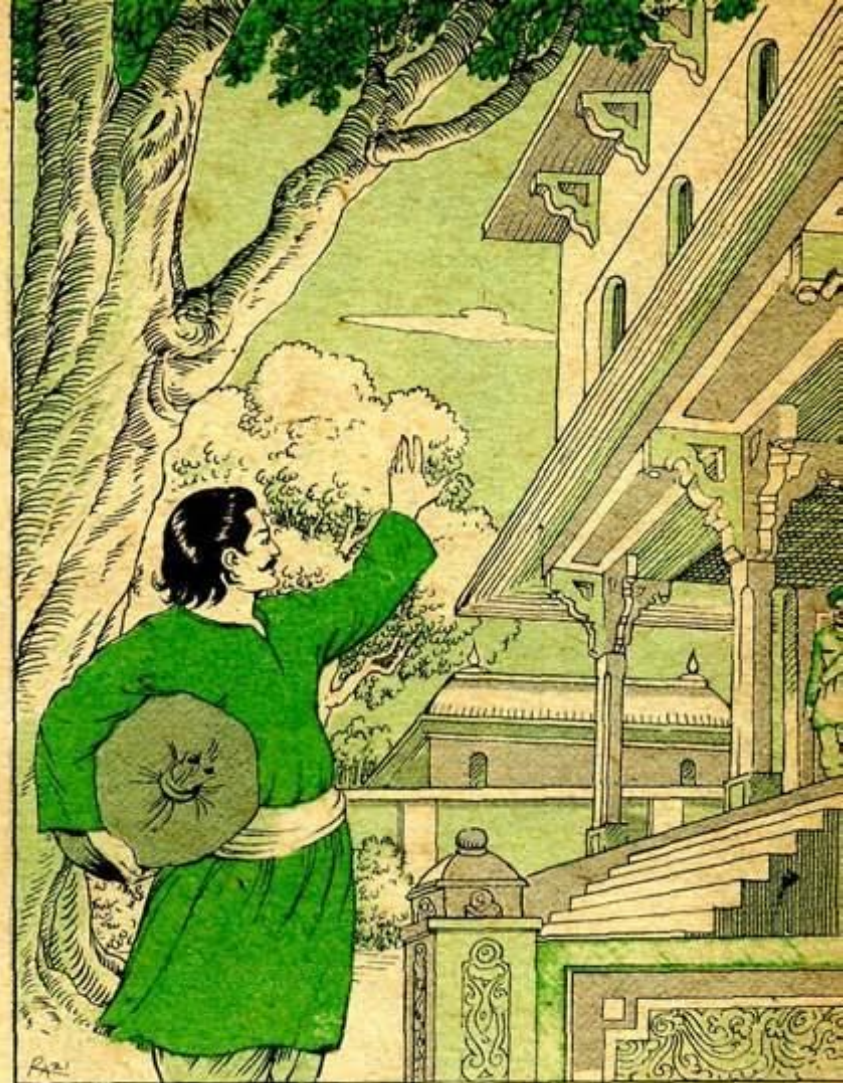
কে জানে। তবে আমাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। আমার থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই। এই অবস্থায় একজন যুবক আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আমাকে গোপনে দশ হাজার টাকা দিল। এত টাকা নিয়ে ধর্মশালায় উঠতে বারণ করল। এত টাকা পেয়ে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তারপর অনেক বছর পরে আমি দশহাজার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ঐ যুবককে খুঁজেছিলাম, পাইনি। অনেক খোঁজ করে জানতে পেরেছি যে এই বুড়োই সেই যুবক। তুমি যদি এই
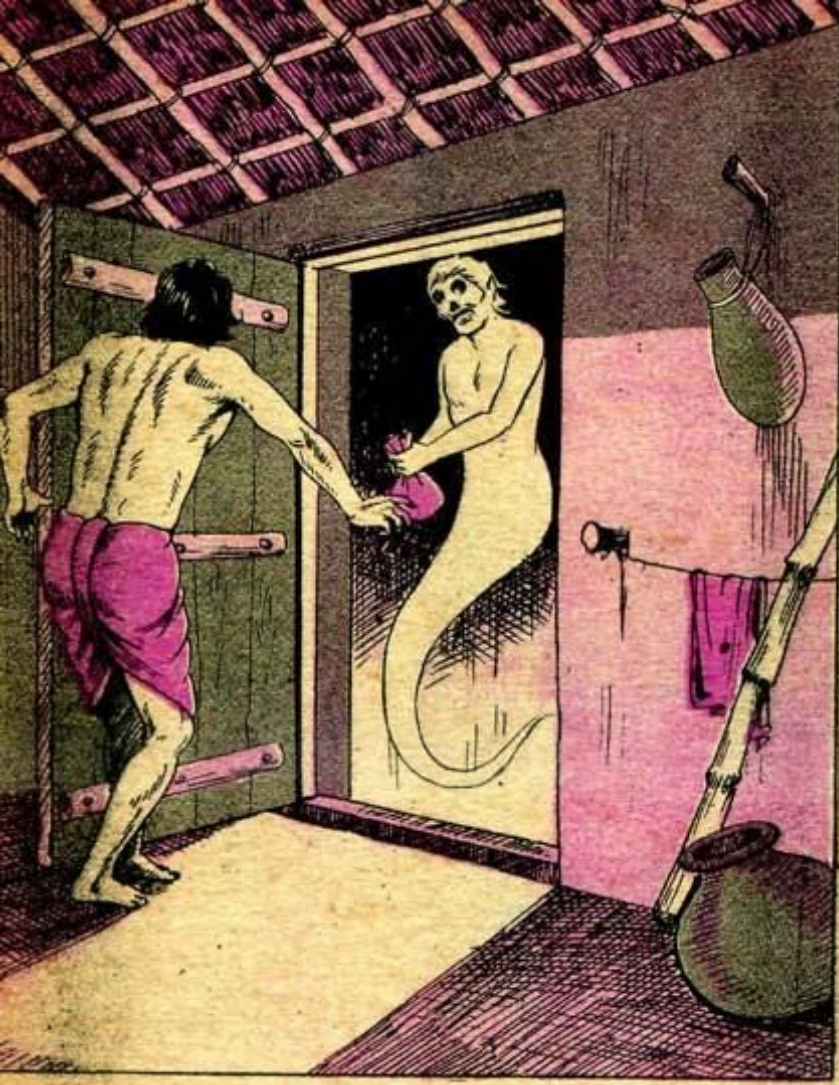
টাকাটা বুড়োকে দিয়ে দাও তাহলে আমি মুক্তি পেতে পারি।" বলে টাকার থলি পর্বতের হাতে দিয়ে ভূত উধাও হয়ে গেল।

টাকাটা নিয়ে পর্বত ঘরে ঢুকল। মনে মনে বলল, "যা করার কাল সকালে করব। এখন টাকাটা থাক।"

এমন সময় দরজায় কে যেন আঘাত করতে লাগল। দরজা খুলে দেখে ভূত।

"কি হল, আবার এলে কেন?" পর্বত ভূতকে জিজ্ঞেস করল।

"আবার এলাম মানে। আমি তো এই প্রথম আসছি। তোমার পাশের বাড়ির বুড়োর কাছে আমি ঋণী। এই নাও, ধর। এই টাকার থলিটা বুড়োকে দাও। এই টাকা দিয়ে তার চিকিৎসা করাও।" বলে নতুন ভূতটা টাকার থলি পর্বতের হাতে দিল।

পর্বতের মনে কৌতূহল জাগল। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুড়োর কাছে কিভাবে ঋণী হলে?" তার প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয় ভূত বলল, "একবার আমার পাঁচ বছরের মেয়ের ভীষণ অসুখ করেছিল। স্থানীয় বৈদ্যরা দেখে তাকে নগরের চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে বলল। আমি সপরিবারে নগরে গেলাম। চিকিৎসকদের মতে ছমাস ধরে তার চিকিৎসা চলবে। পাঁচ-ছ হাজার টাকা খরচ হবে চিকিৎসার জন্য। এত টাকা পাব কোথায়। দুঃখে আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। এমন সময় একজন এসে 'মেয়ের জীবন আগে বাঁচুক' বলে আমাকে দশহাজার টাকা দিল। মেয়ে বাঁচল। কিন্তু আমি ঐ লোকটার ঋণ শোধ করতে পারিনি। মরেও মুক্তি পাচ্ছিনা। অনেক খোঁজ করে জানতে পেরেছি এই বুড়োই সেই লোক। তুমি দয়া করে এই টাকাটা বুড়োকে দিয়ে দাও। এই ঋণ শোধ করতে পারলেই আমি এই ভূতের জীবন থেকে মুক্তি পাব।" দ্বিতীয় ভূতও টাকার

থলি পর্বতকে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পর্বত বউকে জাগিয়ে বলল, "কি গো, এত টাকা জীবনে কখনো দেখেছ? দেখে নাও কত টাকা।"

বউ অত টাকা দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল। তারপর স্বামীকে বলল, "দেখ বুড়োর যা অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি একে আর বাঁচানো যাবে না। তার চেয়ে এই টাকা দিয়ে আমরা আমাদের ছেলেদের মানুষ করতে পারব।"

"না তা হয় না, এ টাকা আমি ঐ বুড়োকে দিয়ে দেব।" পর্বত বলল।

"দিতে চাও দাও। একটা থলির টাকা দাও। অন্য থলিটা রেখে দাও।" পর্বতের বউ বলল।

পর্বত প্রথমে ভাবল কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মনে হল তা করা তার অন্যায় হবে। সে বউকে বলল, "না, আমি দুটো থলিই বুড়োকে দিতে চাই।" বলে সে পরের দিন ঐ দুটো থলি বুড়োকে দিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, পর্বত এরকম করল কেন? সে যা করল তা কি বিনা স্বার্থে? না কি ভূতদের টাকা হজম করতে তার ভয় করল? আমার এই প্রশ্নের জবাব যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "ব্যাপারটা অত জটিল নয়। পরপর দুজন ঋণী থাকার ফলে যে ভূত হয়েছে তা জেনে পর্বতের ঋণী হয়ে ভূত হতে ইচ্ছা করল না। সেইজন্যেই ঐ দুজনের টাকা পর্বত নিজের কাজে খরচ করতে ভয় পেল।"

রাজা এই কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই বেতাল শবসহ আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
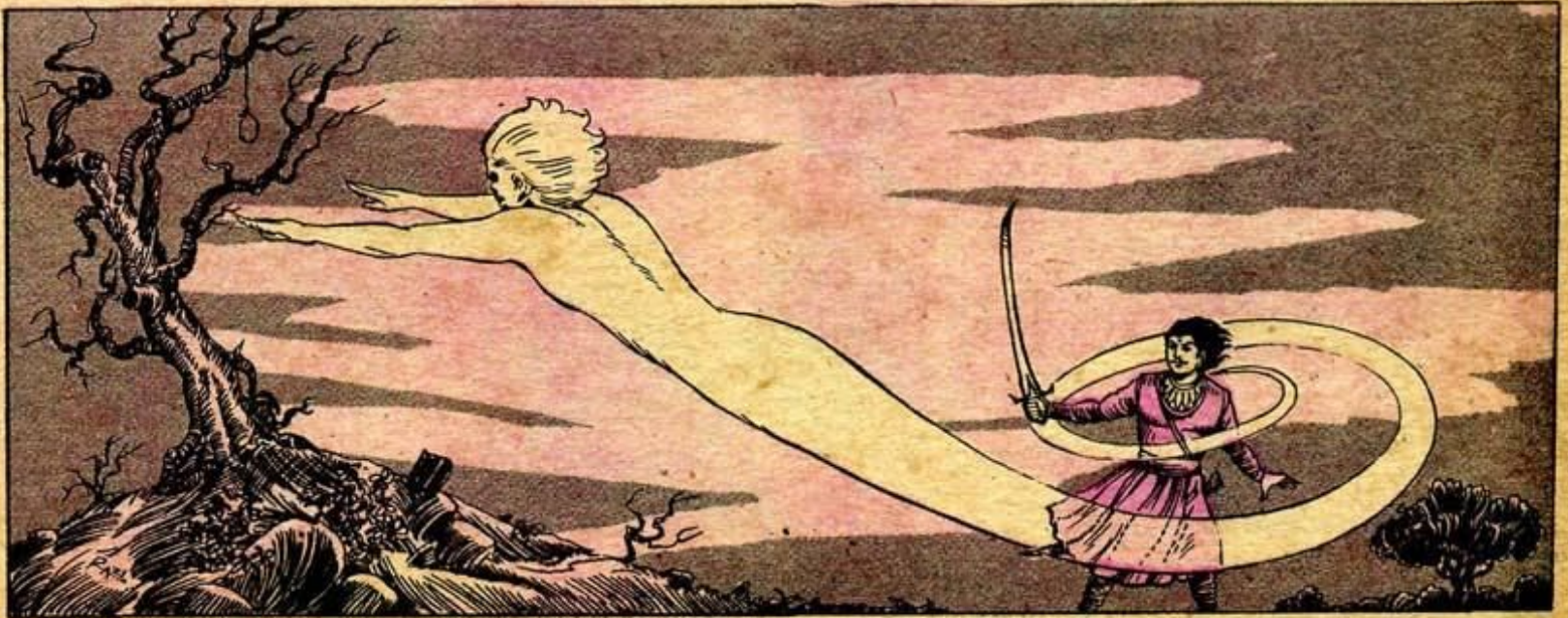
অর্থহীন পরীক্ষা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবের ভেতর থেকে বেতাল বলল, "রাজা, তোমাকে কেউ পরীক্ষা করে দেখছে কিনা জানিনা। তবে কেউ কেউ অর্থহীন পরীক্ষা করে নানা ধরণের কষ্ট দেয়। তাতে কোন পক্ষেরই লাভ হয় না। কষ্ট দিয়েই যেন তারা আনন্দ পায়। আমার কথা যে যথার্থ তার উদাহরণস্বরূপ আমি কাঞ্চনবর্মার মেয়ে রত্নপ্রভার একটি কাহিনী শোনাব। এই কাহিনী শুনলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।" এই বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে সিংহপুরীর রাজা ছিল

বেতাল কথা

কাঞ্চনবর্মা। রত্নপ্রভা নামে তার একটি মেয়ে ছিল। মেয়ের বিয়ের বয়স হওয়ার পর হঠাৎ কাঞ্চনবর্মার মৃত্যু হল। দেশ শাসন করার সমস্ত ক্ষমতা রত্নপ্রভা নিজের হাতে নিল। শাসন চালাতে সে যে ভালভাবেই পারে তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করল। তার ধারণা ছিল, প্রজাদের অসুবিধা যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় ততই মঙ্গল।

বিজয়পুরের রাজা রবিবর্মা রত্নপ্রভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাল। রবিবর্মার ধারণা ছিল রত্নপ্রভাকে বিয়ে করলে সে সিংহপুরী এবং বিজয়পুরের রাজা হতে পারবে। আর তার চেয়ে বড় কথা রত্নপ্রভার মত যোগ্য শাসক পাশে থাকলে দেশ শাসন করা অনেক সহজ হয়।

রবিবর্মা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব না পাঠিয়ে একদিন নিজেই ছদ্মবেশ ধারণ করে রত্নপ্রভার কাছে গিয়ে তার মনের কথা খুলে বলল।

তার কথা শুনে রত্নপ্রভা বলল, "আপনি যে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছেন এতো আমার সৌভাগ্য। তবে আমাকে যিনি বিয়ে করবেন তাকে ছোট একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আপনি কি তাতে রাজী আছেন?"

জবাবে রবিবর্মা বলল, "রাজী না হওয়ার কোন কারণ নেই। এখন কি

ধরনের পরীক্ষা দিতে হবে সেকথা জানতে পারলে খুব সুবিধা হত।”

“পরীক্ষাটা তেমন একটা কিছু নয়। হিমালয়ে শঙ্খবৃক্ষ নামে একটি গাছ আছে। সেই গাছ থেকে ফুল পেড়ে এনে দিতে হবে।” বলল রত্নপ্রভা।

“ও, এই পরীক্ষা? ঠিক আছে।” এই বলে রবিবর্মা রওনা হয়ে গেল।

ঘোড়ায় চেপে হিমালয়ের কাছে পৌঁছাতে রবিবর্মার বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু কয়েকশ ক্রোশ খুঁজেও এমন একজনকে পেল না যে শঙ্খবৃক্ষ চেনে। এমন কি গাছটা যে হিমালয়ের কোন্‌দিকে থাকতে পারে তারও সন্ধান কেউ দিতে পারল না। হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে শঙ্খবৃক্ষের সন্ধান রবিবর্মা পেল না। ইতিমধ্যে অনেক মাস কেটে গেছে। শেষে বাধ্য হয়েই ফিরতে হল।

ফেরা পথেই রবিবর্মা জানতে পারল যে তার প্রতিবেশী রাজা তার দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। রবিবর্মা বুঝল, দেশরক্ষার সুব্যবস্থা না করে হঠাৎ এভাবে হিমালয়ে চলে যাওয়া তার ঠিক হয়নি। বেগতিক দেখে সে আর নিজের দেশে না ফিরে সোজা রত্নপ্রভার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল।

রত্নপ্রভা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলল, “আপনি দুঃখ করবেন না,
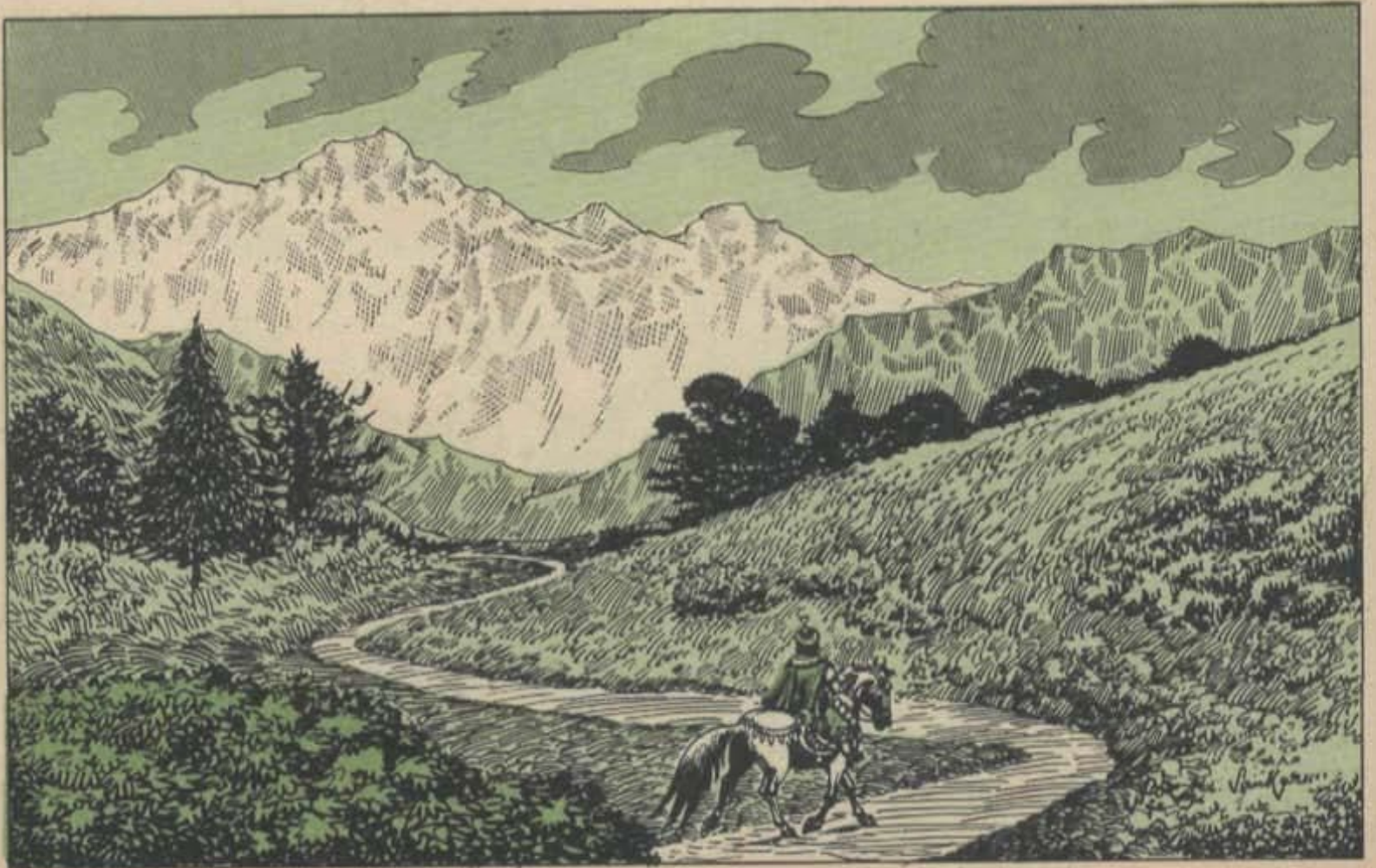
আমি শুনেছিলাম যে আপনার প্রতিবেশী রাজা আপনার অনুপস্থিতির সময় আপনার দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। তবে সেজন্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আমার সেনাবাহিনী আপনার শত্রুকে হটিয়ে, আপনার দেশ উদ্ধার করে আপনার হাতে তুলে দেবে।"

রত্নপ্রভা যা বলল তাই করল। যুদ্ধ করে তার হাতে ঐ দেশটাকে আবার তুলে দিয়ে রত্নপ্রভা বলল, "এবার থেকে আপনি মন দিয়ে দেশ শাসন করুন।"

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, রত্নপ্রভা যেভাবে রবিবর্মাকে পরীক্ষা করল তার কি কোন মানে হয়? সে যখন রবিবর্মার দেশটাকে উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল তখন কি তার উচিত ছিল না তাকে বিয়ে করা? প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "রত্নপ্রভা রাজনীতি বুঝত। সে বুঝতে পেরেছিল রবিবর্মা কেন তাকে বিয়ে করতে চাইছে। এই বিয়ের উদ্দেশ্য যে ভালবাসা নয়, একটি দেশ পাওয়ার লোভ তা সে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। রত্নপ্রভা তাকে বাজিয়ে দেখল তার মধ্যে দেশ শাসন করার দক্ষতা কতখানি আছে। এই পরীক্ষা করার জন্যই সে এমন একটি গাছের নাম বলল যে নামে পৃথিবীতে কোন গাছ নেই। তার যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেল। রবিবর্মা ফিরে আসার পর তার দেশ উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল। এইভাবে পরীক্ষা করে সে বুঝল যে তার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা রবিবর্মার নেই।"

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

সুগন্ধি বৃক্ষ

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার এই ধরণের কাজ দেখে, বিশেষ করে এই পরিশ্রম দেখে যে কোন লোক তোমাকে বুদ্ধিহীন ভাবতে পারে ; কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিহীন লোকও হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে যায়। তার প্রমাণ স্বরূপ বিক্রমবর্মা নামে এক রাজার কাহিনী বলছি। এই কাহিনী শুনতে শুনতে হাঁটলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

বিক্রমবর্মা মগধদেশের রাজা ছিল। তার মন্ত্রীর নাম বিশকুম্ভ। রাজা যত

বেতাল কথা

ভালো ছিল মন্ত্রী ছিল তত খারাপ। সে রাজকাছারী, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি রাজার বিভিন্ন দপ্তরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের চাকরি দিয়ে ঢুকিয়েছিল। রাজার অজান্তে সে বহু দুষ্কর্ম করত কিন্তু সেইসব কুকাজের খবর যাতে রাজার কাছে না পেঁাছায় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজরও ছিল। বিশকুম্ভ অতিশয় ধূর্ত হলেও ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমী। সে দিনরাত পরিশ্রম করত আর রাজাকে তার চোখে চোখে রাখত। কিছুতেই রাজাকে তাঁর রাত্রিকালীন বিশ্রামের আগে চোখের আড়াল করত না।

রাজার ইচ্ছা ছিল মন্ত্রীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তার ইচ্ছামত, তার পরিকল্পনার মত দেশ শাসনের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কেননা রাজা বিক্রমবর্মা নামে বিক্রম হলেও কাজের বেলায় তাঁর তেমন বিক্রম ছিল না। বরঞ্চ রাজা হিসাবে তাঁর তেমন কোন যোগ্যতা ছিলই না বলা চলে। তাই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আকারে ইঙ্গিতে কোন অনুযোগ এলেও রাজা তাতে কান দিত না। বহু অনুযোগ রাজার কাছে পাঠানো সত্বেও যখন কোন কাজ হল না তখন বিক্রমবর্মার শিক্ষাগুরু রামশর্মা ভাবল, সরাসরি রাজার কাছে মন্ত্রীর কুকাজের খবর পাঠাতে হবে। এই কথা ভেবে রামশর্মা একদিন রাজার কাছে এল।

গুরুকে দেখে রাজা বিক্রমবর্মা খুব খুশী হয়ে শ্রদ্ধাভরে তাকে বসিয়ে আলাপ আলোচনা করল। তারপর কথায় কথায় গুরুর আসার উদ্দেশ্য রাজা গুরুর কাছ থেকে জানতে চাইল।

জবাবে রামশর্মা বলল, "তেমন কোন কাজ নেই, একটু জানতে এসেছি দেশের হালচাল কেমন চলছে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ বলল, "গুরুদেব, আমি কিভাবে দেশ শাসন করছি তা

আমি কি করে বলব। আপনি কিরকম দেখছেন তাই বলুন।"

"প্রজারা তো ভালোই আছে। আমার তো মনে হয় প্রজারা তোমার সুগন্ধি বৃক্ষের ছায়ায় আছে। সুগন্ধও পাচ্ছে সব সময়। তোমার ভালোমানুষীর সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।" রামশর্মা বলল।

গুরু রামশর্মার কথা রাজার কাছে হেঁয়ালির মত লাগল। রামশর্মার কথা সে পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল না। কিন্তু এই কথার মধ্যে যে কিছু একটা গূঢ়তত্ত্ব আছে সেটুকু বুঝল। রাজা একমুহূর্ত নীরব থেকে পরক্ষণেই বলল, "গুরুদেব, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।"

তারপর সেইদিনই রাজা গুপ্তচরের মাধ্যমে দেশের খবর জানার চেষ্টা করল। জানতে পারল মন্ত্রীই সবচেয়ে বড় অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। পরের দিনই মন্ত্রীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। মন্ত্রীকে সরানোর পর প্রজাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইল। এত ভাল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে রাজা বুঝল যে সে যা করেছে ঠিক করেছে।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল,
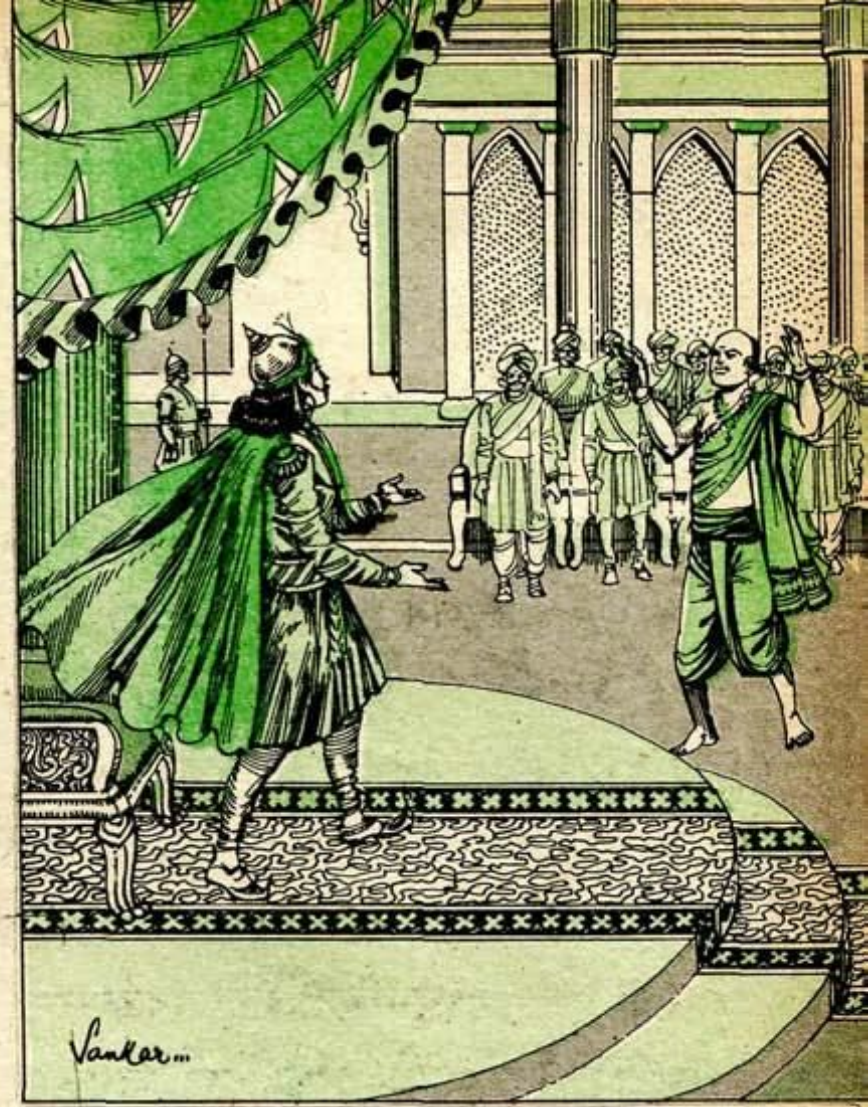
"রাজা, এই যে কাহিনী বললাম এর মধ্যে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। রামশর্মা এসেছিল রাজাকে সবকিছু জানিয়ে দিতে কিন্তু সে তা না জানিয়ে শুধু রাজার প্রশংসা করেই চলে গেল। যে গুরু মন্ত্রীর নিন্দা করতে এসেছিল সে রাজার প্রশংসা করে চলে গেল কেন? আর একটা প্রশ্ন, রাজাই বা রামশর্মা আসার আগে অনেকগুলো অনুযোগ পেয়েও মন্ত্রীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন খোঁজখবর করল না কেন? আমার এই দুটো প্রশ্নের সঠিক জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা

ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।”

প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, “রামশর্মা যে কাজে এসেছিলেন তা সফল হয়েছে। কথা অনেকভাবেই বলা যায়। সরাসরি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে না বলে সূক্ষ্মভাবে রাজাকে বিদ্রূপ করে তিনি চলে গেলেন। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, রাজা রামশর্মার সঙ্গে গোপনে দেখা করেননি। অনেকের মধ্যে দেখা করা, কথা বলা রামশর্মার ভাল না লাগতে পারে। রামশর্মা যদি সেখানে বলতেন, ‘বিক্রমবর্মা তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে।’ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী তার গুপ্তচর লাগিয়ে দিতো। ফলে রাজা এবং রামশর্মার মধ্যে যে কথা হত সে কথা মন্ত্রী জানতে পারত। যে মন্ত্রী সারা দেশে কুকাজ করে বেড়াতে পারে সে যে কোন মুহূর্তে রাজাকে মেরে ফেলতেও পারে। এই, বিষয়টা বুঝতে পেরে রামশর্মা ঘুরিয়ে রাজার প্রশংসা করে চলে গেল। রামশর্মার ঐ একটি কথাতেই কাজ হয়েছিল। এতদিন রাজাকে মনে করা হত তার বুদ্ধি নেই কিন্তু এখন বোঝা গেল রামশর্মার কথা বোঝার মত ক্ষমতা রাজার আছে। সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে শুনেই রাজা বুঝে নিয়েছিলেন যে রাজার কাজকর্মের ব্যাপারে দ্রুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রজাদের মধ্যে। তাই তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করে দেশের কাজের খোঁজ নিলেন। খোঁজ নিতে গিয়ে কানে টান পড়তেই মাথা এগিয়ে এল। মন্ত্রীর স্বরূপ ধরা পড়ল।”

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সদুত্তর শুনে বেতাল খুবই খুশী হল এবং রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব নিয়ে আবার ফিরে চলে গেল সেই গাছে।

(কল্পিত)

পরামর্শ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি তিনি শ্মশানের দিকে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, আমার ধারণা মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়েই তুমি এই ধরণের পরিশ্রম করছ। তবে অনেক যোগ্য মন্ত্রীকেও অবাস্তব পরামর্শ দিতে দেখা গেছে। আমার কথার স্বপক্ষে উদাহরণস্বরূপ আমি রাজা মণিকেত-এর কাহিনী শোনাব। এই কাহিনী শুনতে শুনতে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল :

মণিপুরের রাজা ছিলেন মণিকেত। তাঁর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। অনেক বছর পরে তাঁর একটি মেয়ে হল। বাচ্চা

বেতাল কথা
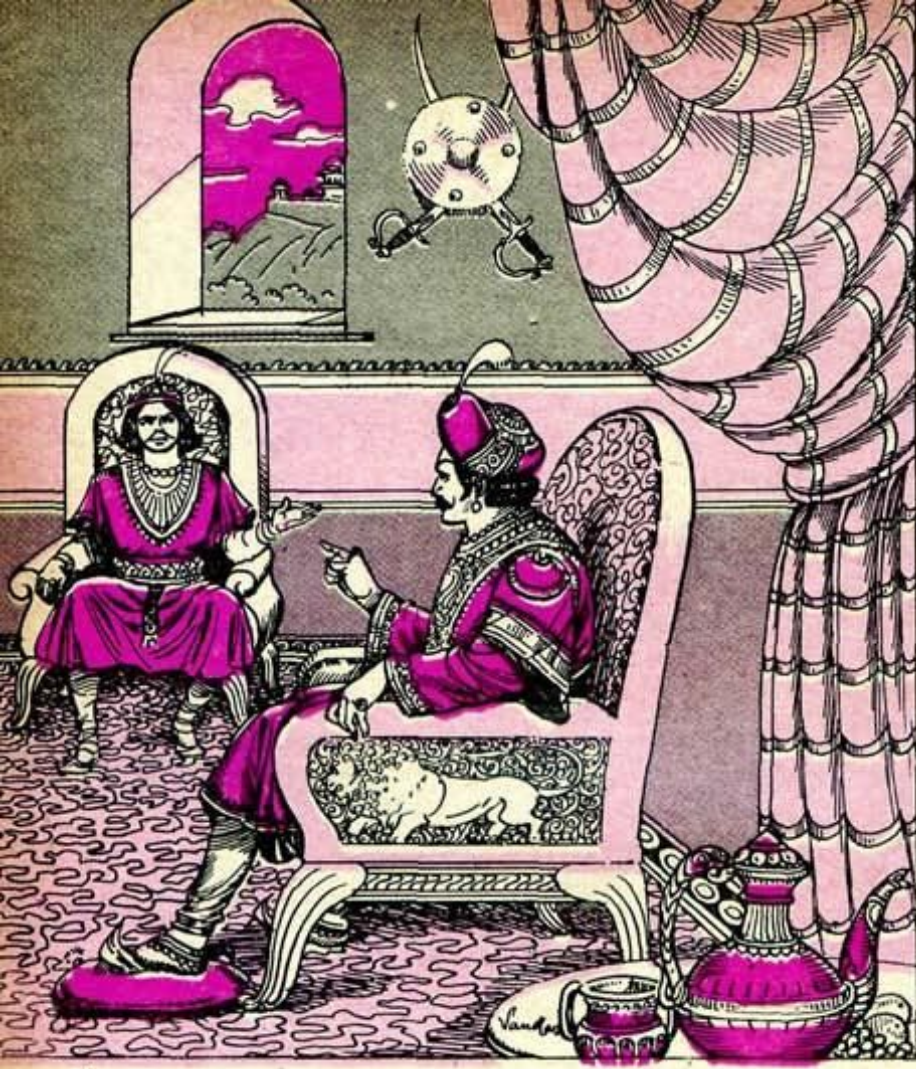
বয়স থেকে মেয়েটিকে ওঁরা আদরযত্নে লালনপালন করল। মেয়েটি যা ইচ্ছা তাই করত, যা মুখে আসত তাই বলত। যখন-তখন সে রেগে যেত। রাগের মাথায় হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে যাকে তাকে মারত। তার এত রাগের কারণ যে কি তা মণিকেত রাজা অনেক চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারেননি। রাজার এই বদমেজাজী ও খেয়ালী মেয়েটির নাম মণিমঞ্জরী।

মণিমঞ্জরী বড় হল। তার বিয়ের বয়স হওয়ার পর মণিকেত রাজার দুশ্চিন্তা অনেকগুণ বেড়ে গেল। এত রাগী খেয়ালী মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তাছাড়া মেয়েটির বিয়ের আগে যদি মণিকেত রাজার মৃত্যু হয়, তাহলে মণিমঞ্জরীকেই দেশের শাসনভার কাঁধে নিতে হবে। আর যাই হোক, দেশের শাসন বদমেজাজী লোককে দিয়ে হয় না। এই অবস্থায় একটিমাত্র পথ খোলা ছিল। তা হল আগে থেকেই ঘোষণা করা যে মণিমঞ্জরীকে যে বিয়ে করবে তাকেই মণিপুরের সিংহাসনে বসানো হবে। ফলে যে সব রাজকুমার মণিমঞ্জরীকে তার মেজাজ এবং খেয়ালের জন্য ভয় পেয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়নি রাজা হওয়ার আশায় তাদের কারো কারো মনে মণিমঞ্জরীকে বিয়ে করার ইচ্ছে জাগতে পারে। আর যে রাজকুমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তার মধ্যে মণিমঞ্জরীর মত মেয়েকে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও থাকতে পারে।

এই কথা ভেবে রাজা মণিকেত বিজয় ও জয় নামে দুই রাজকুমার সহ বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের ডেকে পাঠালেন। তারপর এক এক রাজকুমারকে ডেকে রাজা গোপনে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

রাজা মণিকেত বিজয়কে নিজের

মেয়ের সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে শেষে বললেন, "আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে কার্যত সেই হবে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। তবে একটি কথা আবার আমি বলছি, আমার মেয়ে ভীষণ বদ-মেজাজী। বিনা কারণে সে যখন তখন চটে যায়। রাগের মাথায় সে যে কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। মানে, বলা চলে দুর্বাসার একটি নারীসংস্করণ। তাই তাকে বিয়ে করলে সম্পত্তি পাওয়ার আনন্দ যেমন হতে পারে, তেমনি এহেন রাগী মেয়েকে বিয়ে করার ফলে দুঃখ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। 'এখন তোমাকে সব কথা জানিয়েছি। ভেবে-চিন্তে তোমার মতামত আমাকে জানাও।'

বিজয় বিরক্ত হয়ে বলল, "ওসব আমি জানি। জেনেই এসেছি। এখন বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করুন।"

রাজা তাকে বিদায় দিয়ে জয়কে ডেকে সমস্ত কথা জানালেন।

ধৈর্যের সঙ্গে রাজার সমস্ত কথা শুনে জয় বলল, "মহারাজ, যে কোন লোকের রাগের মুল কারণ দুর্বলতা। কেন জানিনা, রাগী লোককে দেখে আমার মনে করুণা জাগে। যেকোন লোক রেগে গেলে আমি রাগী লোকের ওপরে রাগ না করে রাগের কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। আপনি যা বললেন তা শুনেই বলছি,

করতে পারেন। আমি আর কতটুকু বুঝি।"

রাজা বললেন, "মন্ত্রী, পিতা এবং রাজা হলেই যে একজন সর্বজ্ঞ হবেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোন বিষয়ে রাজা পরামর্শ চাইলে মন্ত্রীর কর্তব্য হল সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।"

মন্ত্রী আর এড়াতে না পেরে বলল, "মহারাজ, বিজয় ভীষণ অধৈর্য্য এবং অবুঝ ছেলে। মণিমঞ্জরীর সঙ্গে তার খাপ খাবে না। জয়ের ধৈর্য্য আছে। তাই আমার ধারণা, জয়ের সঙ্গে মণিমঞ্জরীর বিয়ে হলে ভাল হবে।"

জয় এবং মণিমঞ্জরীর বিয়ে হল। বিয়ের পর থেকেই মণিমঞ্জরীর সঙ্গে জয়ের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক দিন মণিমঞ্জরী জয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। জয় কিন্তু মণিমঞ্জরীকে তেমন কিছু বলত না। তার কথা ধৈর্য্য ধরে শুনত, শুনে চুপ করে থাকত।

এসব কিছু লক্ষ্য করে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "আমার ধারণা, জয় মণিমঞ্জরীর স্বভাব বদলাতে পারবে। এই কাজে সফল হলেই জয়কে সিংহাসনে বসিয়ে দেবো। কারণ যে নিজের স্ত্রীকে ঠিক

মণিমঞ্জরীকে বিয়ে করায় আমার আপত্তি নেই।"

এই দুজনের মধ্যে কার সঙ্গে মণিমঞ্জরীর বিয়ে দিলে যে ভাল হবে তা রাজা বুঝে উঠতে পারলেন না। দুজনের মধ্যে কেউ কম নয়। এই অবস্থায় রাজা মণিকেত মন্ত্রীর পরামর্শ চাইলেন।

মন্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মহারাজ, আপনার মেয়েকে আপনি সবচেয়ে বেশী স্নেহ করেন। এই দেশের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক আপনি। তাই মেয়েকে এবং আপনার প্রিয় দেশকে কার হাতে তুলে দেবেন তা আপনি ভালভাবে যাচাই

পথে আনতে পারবে না সে গোটা দেশের প্রজাদের সঠিকপথে চালিত করবে কি কি করে ?"

মন্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মহারাজ, আমি তো প্রথমেই আপনাকে বলেছি দেশের মঙ্গল কিভাবে হবে তা আপনি সবচেয়ে ভাল করে জানবেন, তাছাড়া পরামর্শ চাইলেই তো হয় না, পরামর্শ অনুসারে কিভাবে কাজ করলে কাজটা সফল হয় সে প্রশ্নও থেকে যায়।"

মন্ত্রীর এই কথা শুনে রাজা বুঝলেন, তাঁর ভুল কোথায় হয়েছে।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, "রাজা, মণিকেত মন্ত্রীর পরামর্শ চেয়ে কি ভুল করেছেন ? মন্ত্রীই বা প্রথমে পরামর্শ দিতে চায়নি কেন ? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "মণিকেত রাজার মতে মন্ত্রীর পরামর্শ দেওয়া উচিত। আসলে রাজা তুটো সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। মণিমঞ্জরীকে কে বিয়ে করবে আর যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন কে করবে ? আসলে একজন এই তুটোর উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাই রাজা মন্ত্রীকে যে প্রশ্ন করলেন সেই প্রশ্নের জবাবে যে পরামর্শ তিনি পেলেন সেই পরামর্শ তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ফলে জয় রাজা হওয়ার উপযুক্ত কিনা সে প্রশ্ন রাজার মনে দীর্ঘকাল থেকে গেছে।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সঠিক পর্যালোচনা ও প্রশ্নের উপযুক্ত ও যথার্থ উত্তর শুনে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

যাদুর কম্বল
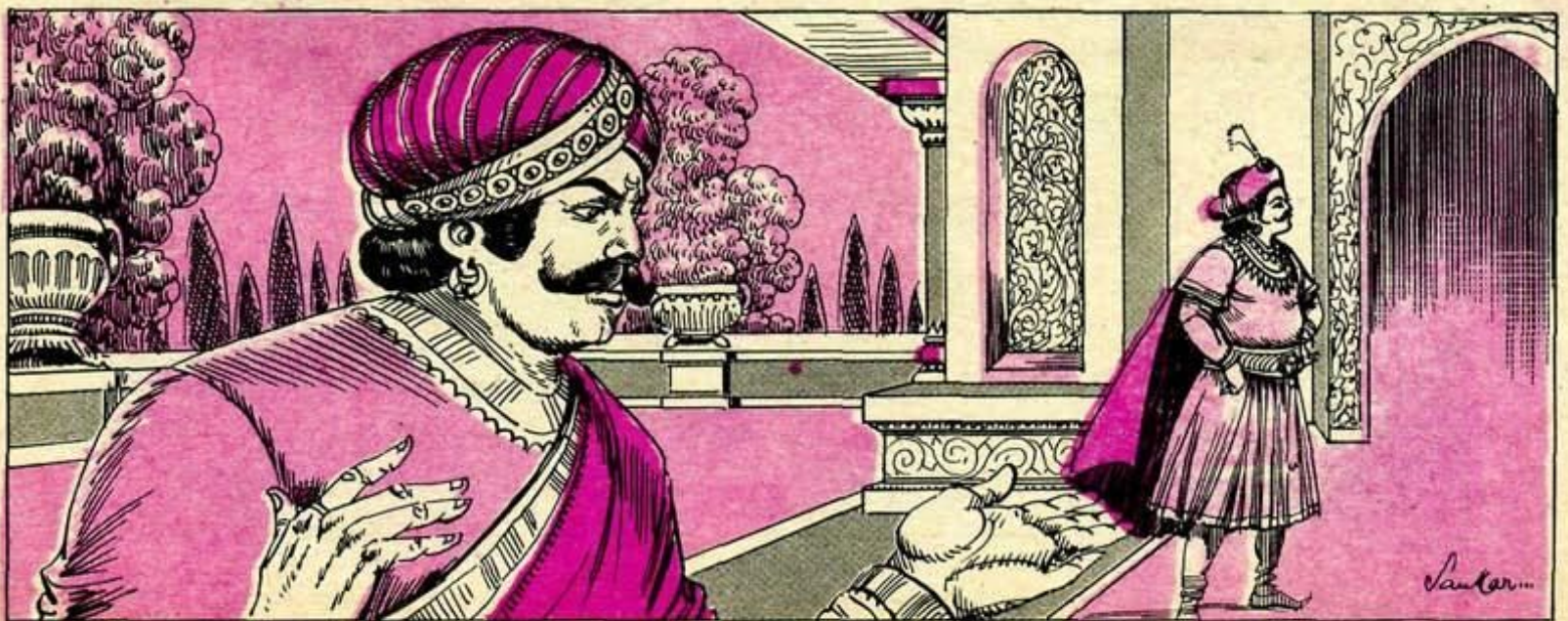
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি নিশ্চয় বিশেষ কোন ক্ষমতা অর্জনের জন্য এত কষ্ট করছ তবে এমনও হতে পারে যে কঠোর পরিশ্রমের পর ঐ ক্ষমতা অর্জন করে তা আবার বর্জনও করবে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কাহিনী বলছি। শুনলে পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে। বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল:

অনেক কাল আগে হিমালয়ে আত্মানন্দ নামে একজন সাধু ছিল। বহু লোক অনেক কষ্ট সহ্য করে ঐ বৃদ্ধ সাধুকে দেখতে যেত। ওরা মাঝে মাঝে ঐ সাধুর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাত নানা ধরনের

বেতাল কথা

বিক্রি ঠিক হবেই। না হয় দুপয়সা কম পেলাম।" লোকটি এই কথা ভেবে কম্বল নিয়ে চলে গেল শোভাবতী নগরের হাটে।

হাটে একটা বুড়ো ভিখিরী ব্যবসাদারের কাছ থেকে ঐ কম্বল কিনে নিল। কম্বল কিনে গায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োটা অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটায় যারা দেখল তারা অবাক হল।

এই খবর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। ঐ সময় শোভাবতী নগরে চুরিডাকাতি যেন বেশি করে হত। শোভাবতীর রাজা চণ্ডীদত্ত অনেক চেষ্টা করেও চোরডাকাত ধরতে পারছিল না। এমন সময় ঐ কম্বলের খবর রাজার কানে যেতেই রাজা ঐ ভিখিরীকে খোঁজার জন্য লোক পাঠাল। রাজার ধারণা ছিল ঐ কম্বলের সাহায্যে চোর ধরার সুবিধা হবে।

রাজা ঐ কম্বল খুঁজছে শুনে ভিখিরী ভয় পেয়ে হাতের লাঠিটা ফেলে দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইল। ভিখিরীর ধারণা ছিল রাজা যদি কম্বল নিয়ে নেয় তাহলে তাকে শীতে কষ্ট পেতে হবে। দিনের পর দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার ফলে ভিখিরী ভিক্ষে পেত না। কিছুদিনের মধ্যেই তার না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা হয়েছিল।

প্রশ্ন করে। বারবার সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় বিরক্ত হয়ে সাধু একটি কম্বলে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে ঐ কম্বলে এমনভাবে নিজেকে মুড়ে রাখতে যে লোকে তাকে দেখতে পেত না। ফলে ঐ কম্বলমোড়া অবস্থায় সাধনা করতে সাধুর সুবিধা হত।

একবার ঐ সাধু একটি খরস্রোতা নদী পেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধু মূর্ছা গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন লোভী ব্যবসায়ী ঐ পথের পাশ দিয়ে হাটে যাচ্ছিল। সে ঐ কম্বল দেখতে পেল। সেভাবল, "এই কম্বল যতই পুরোনো হোক, হাটে যখন যাচ্ছি

এইভাবে কিছুদিন চলার পর সে একদিন রাত্রে গভীরভাবে ভাবতে বসল। সে ঠিক করল এভাবে না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে রাজার হাতে কম্বলটি দিয়ে দেওয়াই ভাল।

পরের দিন কম্বলে গা ঢাকা দিয়ে সে রাজসভায় গিয়ে সোজা রাজার সামনে হাজির হল।

"মহারাজ, এই কম্বল আমার কোন কাজে লাগছেনা। এই কম্বলের জন্য আমার আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে আমি ভিক্ষে পাচ্ছি না। ফলে আমার দুমুঠো ভাত জুটছে না। এটা যদি আপনার কাজে লাগে নিন।" বলে সে রাজাকে তার কম্বলটি দিয়ে দিল।

দেশের এত বড় উপকার করায় খুশী হয়ে রাজা ঐ ভিখিরির সারাজীবনের খাওয়া পরার সুব্যবস্থা করে দিল।

ইতিমধ্যে হিমালয়ের ঐ সাধু খোঁজ করে জানতে পারল যে চণ্ডীদত্ত নামে এক রাজার কাছে কম্বলটি আছে। সাধু সোজা ঐ রাজার কাছে এসে ঐ কম্বল চাইল। রাজা ঐ কম্বলের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলে সেটা নিজের কাছেই রাখতে চাইল।

শেষে সাধু আত্মানন্দ রাজার কাছেই সেই কম্বলটি রাখতে রাজী হয়ে তার হাতে একটি রক্ষাকবচ বেঁধে দিল।
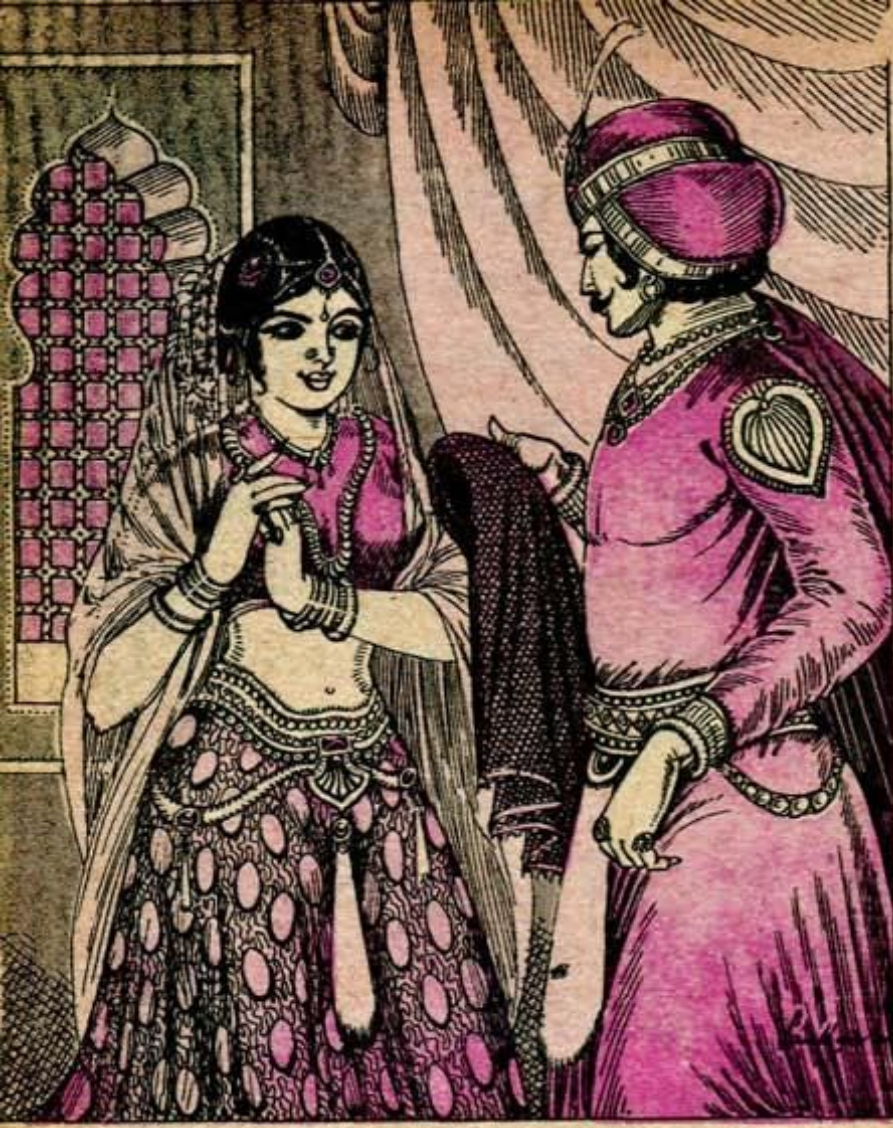
তারপর থেকে রাজা, ঐ কম্বলের সাহায্যে একের পর এক অপরাধীকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই শোভাবতী নগরের চুরি ডাকাতির উপদ্রব কমে গেল। লোকে বুঝল রাজা ঐ কম্বলের সাহায্যে চোর ধরেছেন।

একদিন রাজনর্তকী চঞ্চলার বাড়িতে গেল রাজা। সেদিন বিশেষ মুহূর্তে চঞ্চলা দুদিনের জন্য ঐ কম্বল রাজার কাছে চাইল। রাজা চঞ্চলাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে এসে তাকে কম্বলটি দিয়ে দিল।

তারপর চঞ্চলা কম্বল মুড়ি দিয়ে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরমুহূর্তেই রাজা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, কম্বল মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও চঞ্চলাকে দেখা যাচ্ছে। কম্বল মুড়ি দেওয়ার পর কখনও কাউকে দেখা যায় না। অথচ চঞ্চলাকে দেখতে পাওয়ায় রাজা প্রথমে অবাক হলেন কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, সাধুর রক্ষাকবচের গুণেই হয়ত চঞ্চলাকে দেখা যাচ্ছে।

রাজনর্তকী চঞ্চলা একান্তভাবে তারই। তাকে অন্য কারো বাড়ির দিকে যেতে দেখে রাজা চণ্ডীদত্ত অবাক হল।

স্বভাবতই রাজার ইচ্ছা করল চঞ্চলা কোন্ দিকে যায় তা দেখার। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল চঞ্চলা নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে, গেল কোষাগারের অধিকর্তার বাড়িতে। এটা লক্ষ্য করে রাজা ফিরে এসে শুলো কিন্তু তার চোখে ঘুম এল না। কোষাগারের অধিকর্তার নাম ছিল বিক্রম। বিক্রম ছিল রাজার আত্মীয়। আত্মীয় কি তার বিরুদ্ধে কিছু করছে! এই প্রশ্ন তার মনে জাগল।

বিক্রম কম্বল মুড়ি দিয়ে হাতে ছোরা নিয়ে রাজার ঘরে ঢুকল। বিক্রমকে ছোরা হাতে ঢুকতে দেখে রাজা বুঝতে পারল যে

তাকেই মেরে ফেলার জন্য বিক্রম ঢুকছে। কোন রাজাই তার বিরুদ্ধে দেশের কোন প্রান্তে কেউ চক্রান্ত করুক তা সহ্য করে না। চণ্ডীদত্ত বিক্রমের এই চক্রান্ত সহ্য করেনি। কিছুক্ষণ ভেবে রাজা ঠিক করল বিক্রমকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। ফলে বিক্রম আক্রমণ করার আগেই রাজা তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল।

তারপর রাজার নির্দেশে রাজনর্তকীকে প্রহরীরা বন্দী করে আনল। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে রাজাকে হত্যা করে দেশের রাজা হওয়ার ইচ্ছা ছিল বিক্রমের। বিক্রম রাজা হলে চঞ্চলা হত রাণী। এই ছিল শর্ত। সেই শর্ত অনুসারে চঞ্চলা রাজার কাছ থেকে ঐ কম্বল এনে দিয়ে বিক্রমকে সাহায্য করেছিল।

সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশ হওয়ার পর রাজা চণ্ডীদত্ত চঞ্চলাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করল।

পরের দিন রাজা হিমালয়ে গিয়ে খুঁজে খুঁজে আত্মানন্দের কাছে গিয়ে বলল "প্রভু, আপনার কম্বল আপনি নিয়ে নিন।" বলে রাজা ঐ যাদুর কম্বল সাধুকে দিয়ে ফিরে গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, এখন আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। আত্মানন্দ কম্বলের খোঁজ করে, অত কষ্ট করে রাজার কাছে গেল
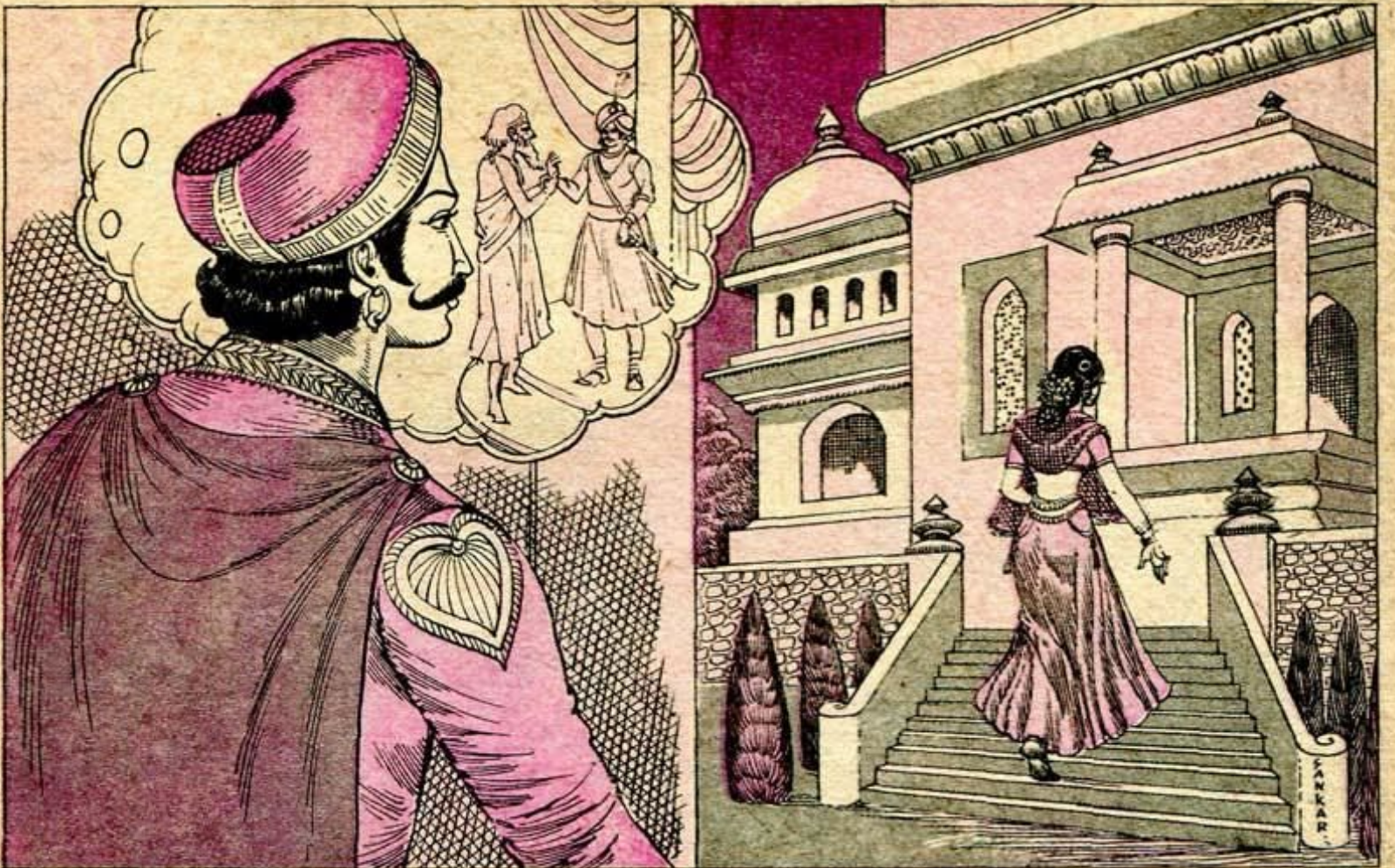
কেন? অত ক্ষমতাবান সাধু ইচ্ছা করলে আর একটা কম্বল তৈরী করে নিতে পারত। নিজের তৈরী করা যাদুর কম্বল আর একজনের কাছে থাক এটা কি সাধুর ইচ্ছা ছিল না? যে রাজা ঐ কম্বলের সাহায্যে এতরকম সাহায্য পেল, এমন কি নিজের প্রাণ ও বাঁচাতে পারল সেই রাজা কেন কম্বলটি সাধুকে ফেরত দিল?

দেশে বিক্রমের মত বিশ্বাসঘাতক আরও তো বহু থাকতে পারে? আমার এই সব প্রশ্নের জবাব জানা সত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "যে কোন যাদুর জিনিসের উপকারিতা বা অপকারিতা নির্ভর করছে তার প্রয়োগকর্তার উপর। কম্বলের ফলে ভিখিরীর না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা হয়েছিল। এতেই আমরা বুঝতে পারি কম্বলটি তার কোন কাজে লাগেনি। আবার ঐ কম্বল দিয়ে দুষ্টের দমন করতে পেরেছিল রাজা। রাজার কথা শুনে, তার কাছে কম্বল রাখতে রাজী হয়ে সাধু রাজার হাতে রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছিল। কে কি ভাবে ব্যবহার করবে এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলেই সাধু রাজার কাছ থেকে কম্বল আনতে গিয়েছিল। রাজাও চঞ্চলাকে কম্বল দেওয়ার পর, বিক্রমের ঐ কম্বল ব্যবহারের পর বিশেষভাবে অনুধাবন করল যে কম্বলের ব্যবহার সকলের হাতে একভাবে হবে না।

সেইজন্যই আত্মানন্দ সাধুর কম্বল সাধুর হাতে ফেরত দেওয়া হল।"

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

সাধুর কৌটো

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, “রাজা, তুমি যে কোন্ দিকের পক্ষপাতিত্বের ফলে এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে এটুকু জানি সংসারিক সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে যারা অরণ্যে তপস্যা করে তারাও পক্ষপাতহীন নয়। আমার বক্তব্যের সাক্ষীস্বরূপ একটি কাহিনী শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হতে পারে।” বলে বেতাল কাহিনী শুরু করে দিল ঃ

এক সময় ধনবর্মা ও ধীরবর্মা নামে

বেতাল কথা

দুই রাজা পাশাপাশি রাজত্ব করছিল দুই দেশে। দুটো দেশের মাঝখানে একটা অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে জ্ঞানশেখর নামে এক সাধুর কুটির ছিল। সাধু তপস্যা করত। দু দেশেরই প্রজা ঐ সাধুর কাছে আসত। নিজেদের সমস্যার কথা বলত। শুনে সাধু যে পরামর্শ দিত সেই পরামর্শ অনুসারে ওরা কাজ করত।
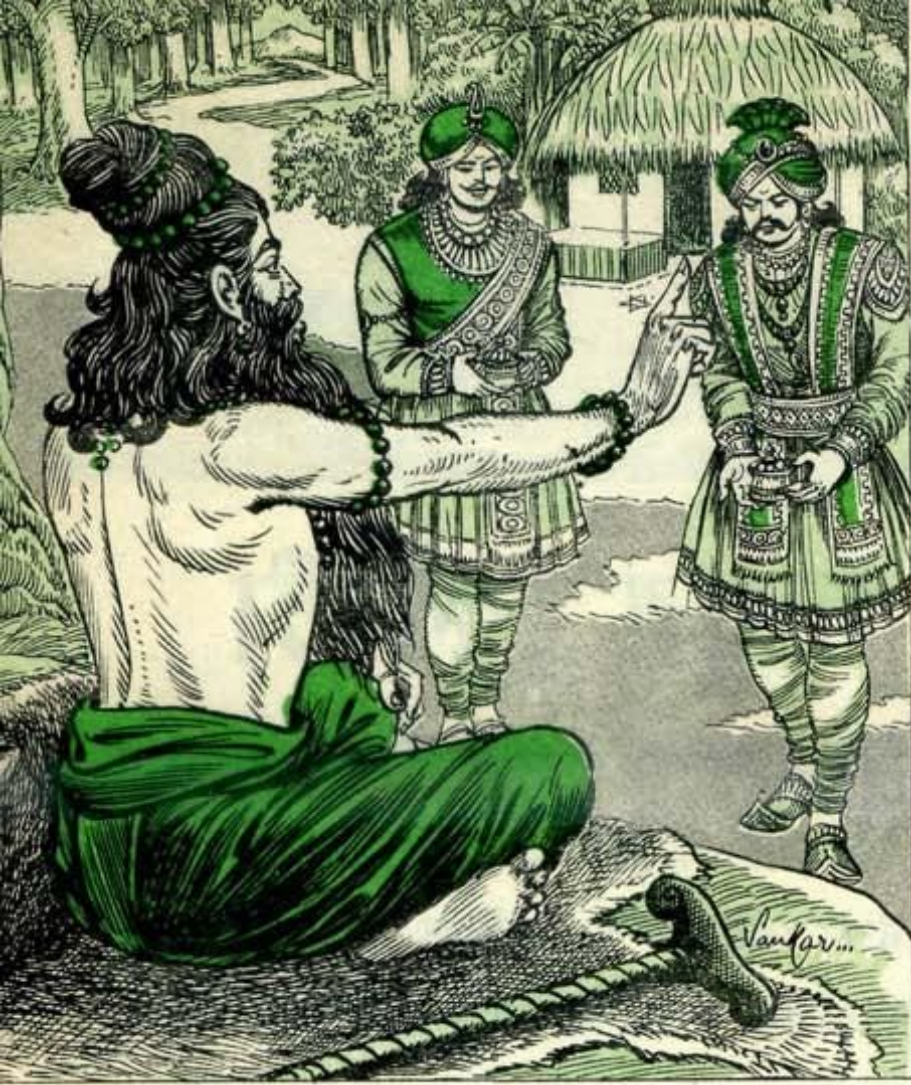
সে বছর বর্ষা ভালোভাবে না হওয়ায় আকালের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দুটো দেশেরই একই অবস্থা। একদিন ধনবর্মা ও ধীরবর্মা সাধুর কাছে পরামর্শ নিতে এল। ওদের বক্তব্য শুনে সাধু জ্ঞানশেখর বলল, "দেখ বাবা, তোমাদের দুজনকেই একটা করে কৌটো দিচ্ছি। যখনই তোমরা বিপদে পড়বে কৌটো খুলে দেখবে। তোমাদের সমস্যার সমাধান তোমরা তাতে খুঁজে পাবে। তবে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। খুব ছোট ছোট সমস্যার সমাধান এতে খুঁজে পাবে না। এখন আমি কিছুকালের জন্য সমাধিস্থ হব।"

এইভাবে বলে সাধু দুই রাজাকে দুটো কৌটো দিয়ে দিল। রাজারা যে যার কৌটো নিয়ে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেল।

ধনবর্মা আকালের সময় কি করা উচিত সে ব্যাপারে মন্ত্রী ও ব্যবসাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে কোন সমাধান যখন খুঁজে পেল না তখন ঐ কৌটো খুলল। তাতে যে মূল্যবান অপূর্ব বস্তু ছিল। সেই বস্তু বিদেশে বিক্রি করে বিদেশ থেকে ধান আনিয়ে সে দেশের খাদ্যাভাব মেটাল।

কিন্তু ধীরবর্মা তা করল না। অভাব বা আকালের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সে কয়েকটা কাজ হাতে নিল। সেই কাজ করে ফল না পাওয়া গেলে

তখন কৌটো খুলে দেখা যাবে ভাবল। প্রথমেই সে চেষ্টা করল যাতে দেশের ধান দেশের বাইরে কেউ নিয়ে না যায়। ব্যবসাদারদের কাছে যত ধান ছিল সব ধান রাজা নিয়ে নিল। নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। ফলে সে বছর প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে নি।

ধীরবর্মার চেয়ে সেবছর ধনবর্মা তার প্রজাদের অনেক ভালো খাইয়েছিল। তাই সে সগর্বে বলল, "আমার দেশের প্রজা এই বছর সবচেয়ে ভালো খেতে পেয়েছে। আশেপাশের কোন প্রজা এত খেতে পায় নি। কোন রাজা প্রজাদের এত ধান খেতে দেয় নি। আগামী বছর আমি প্রজাদের আরও বেশী করে খাওয়াতে চাই আরও ভালো রাখতে চাই। মন্ত্রীগণ, বলুন, কিভাবে তা সম্ভব হবে।" মন্ত্রীরা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মহারাজ, গত বছরের মত আপনি সাধু জ্ঞানশেখরের ঐ কৌটো খুলুন।"

ধনবর্মা মন্ত্রীদের পরামর্শে সেটা খুলে দেখতে পেল একটি কাগজ তাতে শুধু লেখা আছে "জাগো, দেখ।"

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই এক
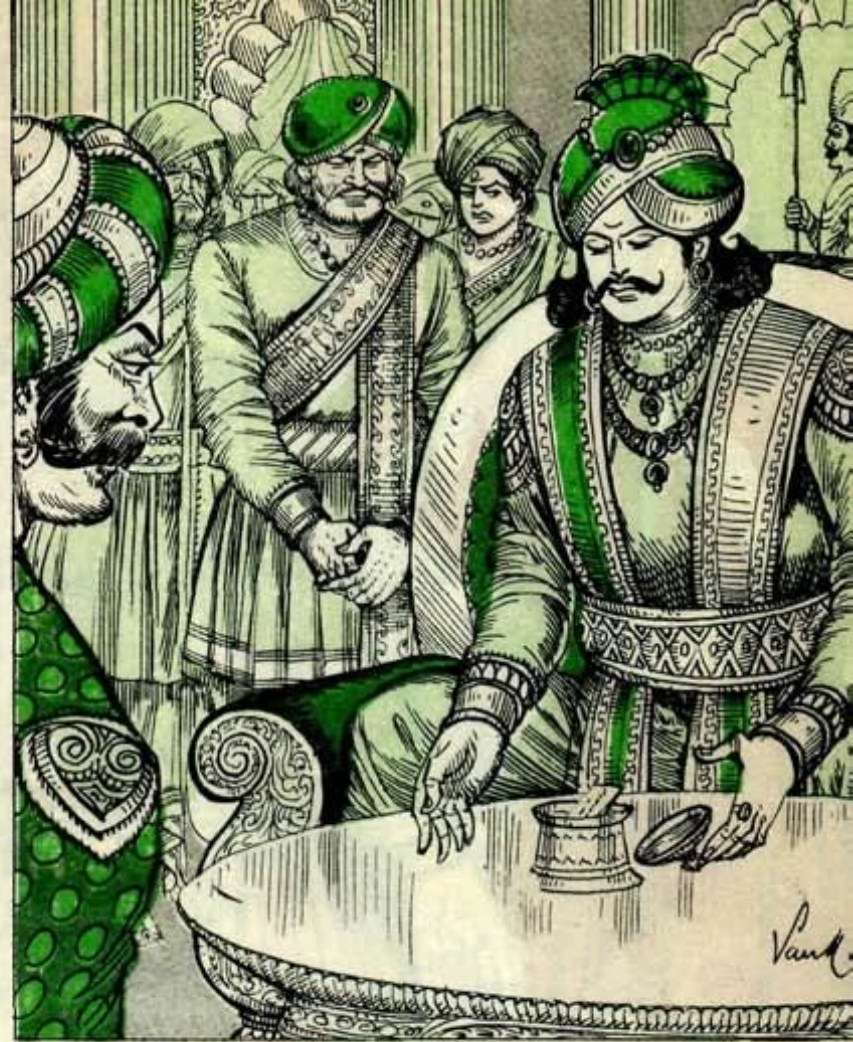
সাধু ধনবর্মার সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে বলল, "মহারাজ, আমার কাছে একটি যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্র দিয়ে ভূগর্ভে কোথায় কত সম্পদ আছে তা জানা যাবে। আমি এই যন্ত্র দিয়ে যেখানে দেখাব সেখানে খুড়ে দেখুন সম্পদ পাবেন। এভাবে খুঁড়ে খুঁড়ে আপনি আপনার দেশে অনেক সম্পদ মাটির তলা থেকে তুলতে পারবেন। তবে যত সম্পদ উঠবে তা বিক্রি করে যত পাবেন তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।" রাজা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। তারপর

ঐ সাধুর যন্ত্রের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় খোঁড়া শুরু হয়ে গেল। মাটির তলা থেকে অনেক সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি পাওয়া গেল। বিক্রি করে অর্ধেক দাম সাধুকে রাজা দিয়ে দিল।

দেখাদেখি ধীরবর্মার মন্ত্রীরা রাজাকে উপদেশ দিল জ্ঞানশেখরের কাছে আনা কৌটোটা খুলতে। কারণ ঐ কৌটো খুলে পাশের দেশের রাজা ধনবর্মা নিজের দেশের অনেক উন্নতি করেছে।

কিছুদিন পরে যে সাধু যন্ত্র নিয়ে ধনবর্মার দেশে গিয়েছিল সেই সাধু ধীরবর্মার কাছেও এল। ধনবর্মাকে যেভাবে যা বলেছিল ধীরবর্মাকেও তাই বলল। তার কথা শুনে ধীরবর্মা বলল "দেখুন, আপনি যদি আপনার যন্ত্র বিক্রি করতে চান আমি সানন্দে আপনার যন্ত্র কিনে নিতে পারি। কিন্তু আপনাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গার মাটি খুঁড়ে, দেশের সমস্ত সম্পদ বের করে আপনাকে তার অর্ধেক দিতে রাজী নই।"

এই ধরণের যন্ত্র আমার কাছে ছাড়া পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই। তাই এটা আমি বিক্রি করতে চাইনা। আমার স্বার্থে আপনি রাজী হলেন না; তবে মনে রাখুন, এই যন্ত্র ছাড়া মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বিভিন্ন জায়গার সম্পদ বের করতে আপনার পঞ্চাশ বছর লেগেযাবে। আপনার দেশ পেছিয়ে যাবে।"

কিছুকাল পরে জ্ঞানশেখর সমাধি থেকে উঠে আশেপাশের কোন্ দেশের কি অবস্থা জানার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ধীরবর্মা জ্ঞানশেখরকে জানাল, "নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে যতটা পেরেছি সমস্যার সমাধান করেছি। আপনার কৌটো আমি এখনও খুলিনি।"

তারপর জ্ঞানশেখর গেল ধনবর্মার কাছে। সে বলল, "দেখুন, আমি আমার প্রজাদের কত ভালো রেখেছি। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছি কৌটো খুলেছি।"

জ্ঞানশেখর ধীরবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নেয় নি। কিন্তু ধনবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, "রাজা, জ্ঞানশেখর এক রাজার কাছ থেকে কৌটোটা ফেরত নিল অন্য রাজার কাছ থেকে নিল না। এর কারণ কি? নিশ্চয় ধীরবর্মার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। ঐ কৌটোর ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "জ্ঞানশেখর কৌটো ফেরত নিল ধনবর্মার কাছ থেকে। কারণ ধনবর্মা সাধুর দুটো কথাই রাখলেন না। তিনি পর পর দুবার ঐ কৌটোটি খুলেছিলেন। যে সমস্যা দেখা দিল তার সমাধান করার উপায় রাজা ভাবেন নি। কৌটো খুলে সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ধান কিনে অপচয় করেছিলেন। দ্বিতীয় অপরাধ করেছিলেন মাটির তলার সমস্ত সম্পদ তুলে, শেষ করে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মাটির তলায় কিছুই রাখলেন না। কিন্তু ধীরবর্মা ঐ কৌটো বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করেননি। বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান করেছেন। তাই সাধু তা রেখে দিল।"

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

নকল সুধীর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে তিনি যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার আশা পূরণ না হওয়ার কারণ হিসেবে তুমি হয়ত ভাবছ তোমার অলৌকিক শক্তি নেই। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। মৈত্রেয়ের কাহিনী শুনলে আমি যা বলতে চাইছি তা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার এই কাহিনী শুনলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করে দিল ঃ

উজ্জয়িনী নগরের রাজা ছিলেন সুধীর। তাঁর প্রাসাদে বীরদাস নামে এক

বেতাল কথা

নামকরা শিল্পী ছিল। মৈত্রেয় নামে তার এক ভাই ছিল। মৈত্রেয় হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে বহু সিদ্ধ-পুরুষকে সেবা করে এক অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল। সেই শক্তি হল শিল্পে প্রাণ সঞ্চার।

মৈত্রেয় তার অলৌকিক শক্তি রাজাকে দেখাতে চাইল। তার দাদাকে দুটো নারীমূর্তি তৈরি করতে বলল। ভরা রাজসভায় সে ঐ দুটি নারীমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করল। তা দেখে রাজা এবং অন্যান্য সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।
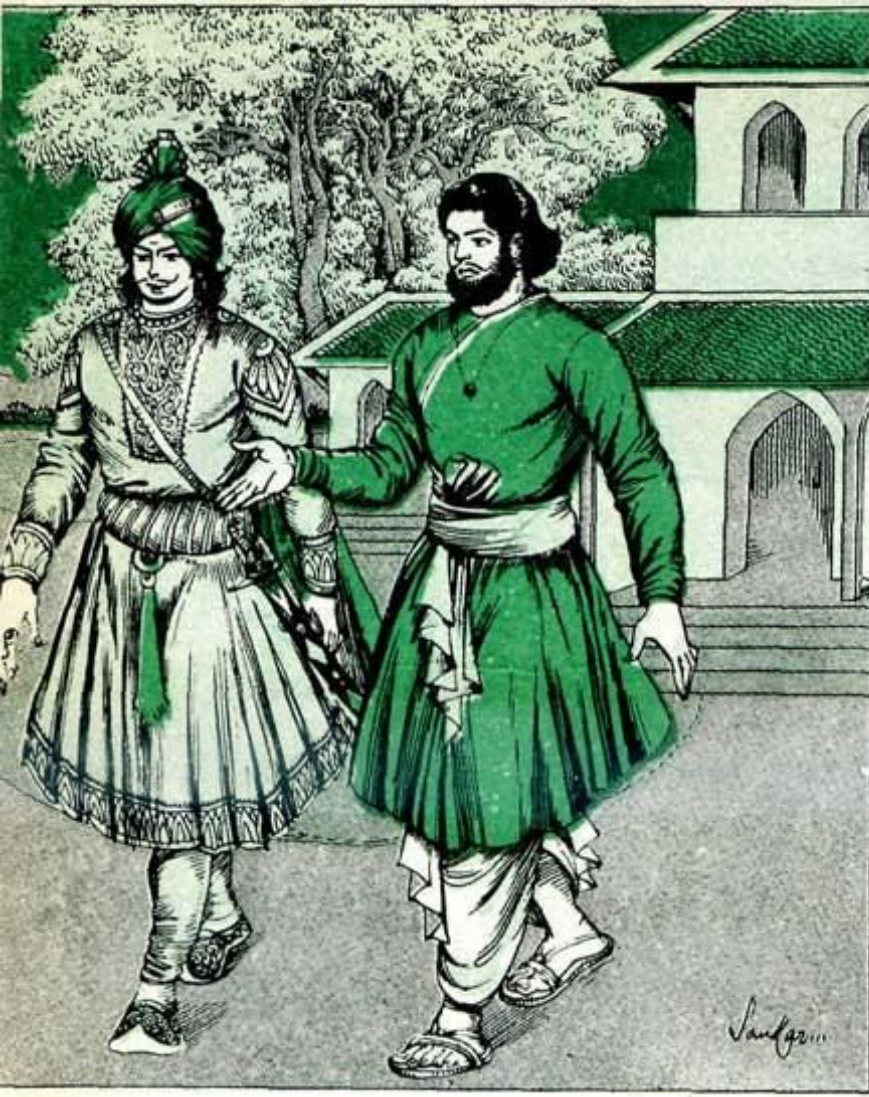
মহারাজ সুধীর, তারপর মৈত্রেয়কে তাঁর প্রাসাদে থাকতে অনুরোধ করলেন। মৈত্রেয় রাজার অনুরোধে প্রাসাদে থেকে গেলেন। কিছুকালের মধ্যে সুধীর ও মৈত্রেয়র মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একবার সুধীরের ইচ্ছে করল নিজের বিকল্প রূপ ও আকৃতি দেখার। মনের এই ইচ্ছা রাজা সুধীর মৈত্রেয়ের কাছে প্রকাশ করলেন। মৈত্রেয় তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে রাজী হল।

মৈত্রেয় রাত্রে তার দাদা বীরদাসকে রাজা সুধীরের মূর্তি তৈরি করতে বলল। বীরদাস পাথর দিয়ে সুধীরের মূর্তি তৈরি করল। মধ্যরাত্রে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নকল সুধীরকে নিয়ে মৈত্রেয় রাজভবনের দিকে গেল।

অন্য দেশের রাজধানীর মতই উজ্জ-য়িনীতেও শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ছিল। ওরা অতর্কিতে নকল সুধীরকে আক্রমণ করে, মেরে ফেলে পালিয়ে গেল। সকাল হতে না হতেই চারদিকে রাজার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর মুখেমুখে আবার প্রচারিত হল যে আসল রাজার মৃত্যু হয়নি, নকল

রাজার হয়েছে। এই খবর শুনে প্রজা-দের উদ্বেগ কমে গেল। কিন্তু দেশে দুষ্ট শক্তিগুলো ব্যাপারটাকে ঐখানেই শেষ করল না। ওরা সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা প্রচার করল। ওদের প্রচার ছিল, "আসল রাজাই মারা গেছে। এখন যে রাজা আছে সেই রাজা মৈত্রেয়ের তৈরি নকল রাজা। রাতারাতি হঠাৎ শত্রুর হাতে রাজা নিহত হওয়ায় মৈত্রেয় তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে নকল রাজা তৈরি করল।"

এই প্রচার যারা শুনল তারা সহজে তা অস্বীকার করতে পারল না। কারণ ওরা জানত রাজা সুধীরের সঙ্গে মৈত্রেয়ের সম্পর্ক গভীর ছিল।

শুধু যে প্রজাদের মধ্যেই এই প্রচার ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, অন্তঃপুরের দাস-দাসী এমন কি রাণীর মনেও এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সকলেরই মনে সন্দেহ ঢুকেছিল।

স্বভাবতঃই, এই অবস্থা রাজা সুধীরের মনে ব্যথা দিয়েছিল। কিভাবে যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তখন তিনি মৈত্রেয়কে এই সমস্যার সমাধান করতে বললেন। ইতিমধ্যেই মৈত্রেয় এই সমস্যা নিয়ে ভাবছিল। তার সামনে একটি মাত্র উপায় ছিল।
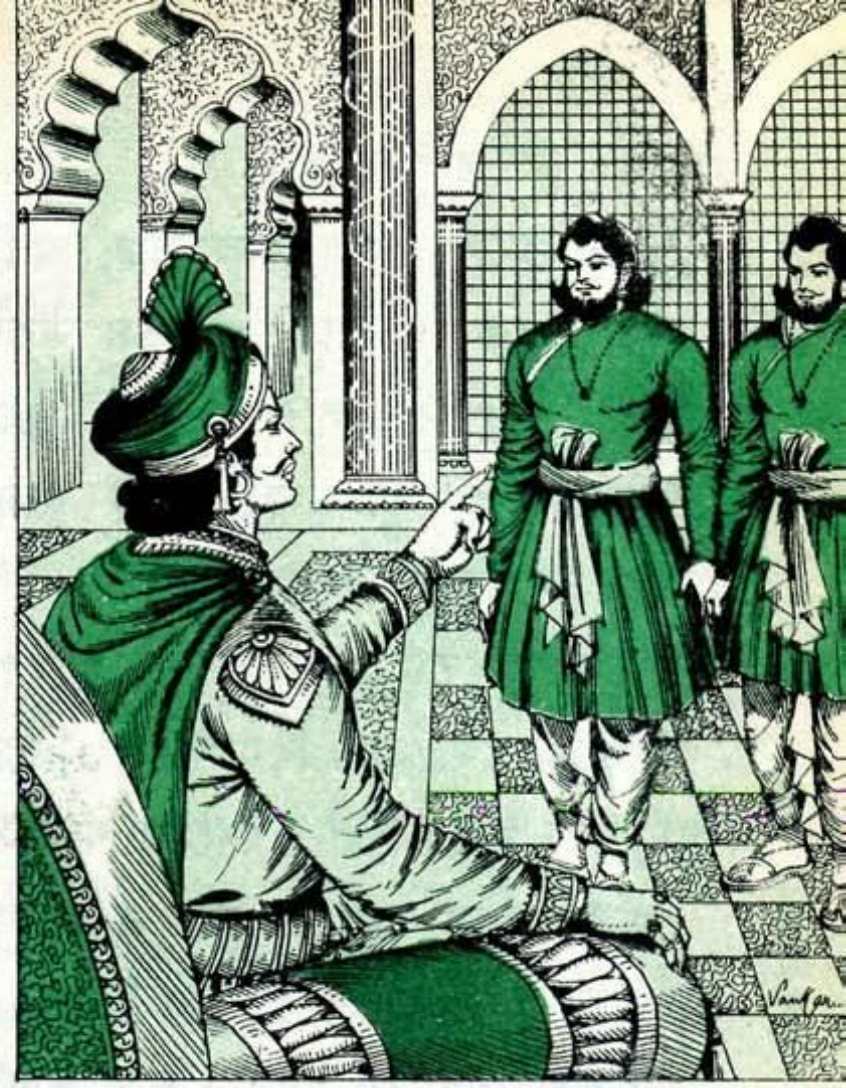
মৈত্রেয় সেদিন রাত্রে তার নিজের চেহারার মত একটি মূর্তি গড়তে তার দাদাকে বলল। শিল্পী বীরদাস মৈত্রেয়ের মূর্তি তৈরি করল। সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে এক রাত্রে মৈত্রেয় গোপনে রাজার সামনে গিয়ে হাজির হল। রাজা সুধীর দুই মৈত্রেয়কে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে যে আসল

মৈত্রেয় বুঝতে পারছি না।"

তখন মৈত্রেয় বলল, "মহারাজ, আমি আসল মৈত্রেয়। আর এটি হল নকল মৈত্রেয়। আপনি কাল প্রকাশ্য রাজসভায় দেশদ্রোহী ঘোষণা করে এই নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিন।"

"তারপর তোমার অবস্থা কি হবে?"

"আমি গোপনে হিমালয়ের দিকে পাড়ি দেব মহারাজ।" মৈত্রেয় বলল।

পরের দিন সকালে ভরা রাজসভায় রাজা নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে আবার বলল, "রাজা, মৈত্রেয় যে সমাধান বের করল সেটা যে সঠিক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অত কষ্ট করে যে অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল সেই অলৌকিক শক্তি পেয়েও বেচারাকে হিমালয়ে ফিরে যেতে হল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "অলৌকিক শক্তি ব্যবহারিক জীবনে কতটা যে কাজ দেয় তা কেউ বলতে পারে না। আসলে ঐসব শক্তির উপর মানুষের ক্ষমতা থাকে না। যে মৈত্রেয় অতবড় অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিল তার পক্ষে আর চারজনের মত ঘোরাফেরা করা সম্ভব নয়। সেটা সে টের পেয়েছিল দেরিতে। টের পেয়েই সে আর রাজধানীতে থাকতে পারলনা।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
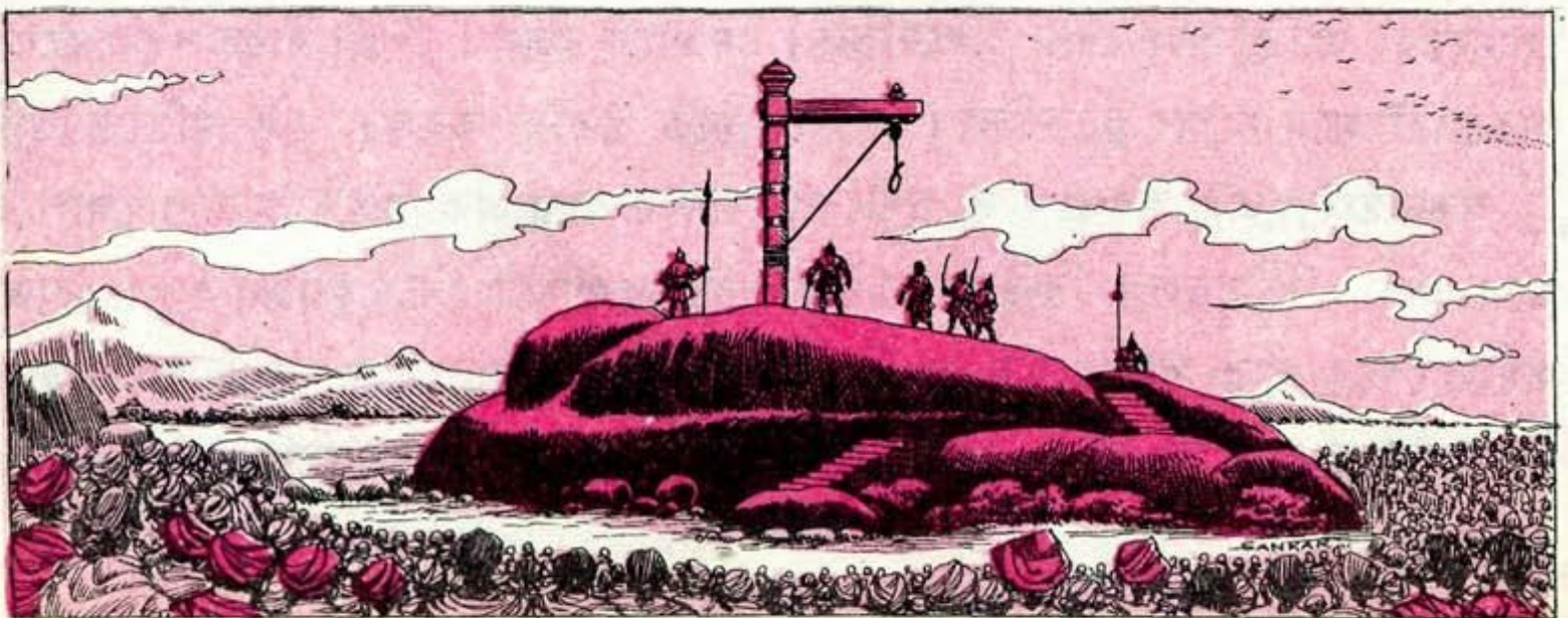
রাজার খাতির

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেও না। কেউ কেউ প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে এগিয়ে যায়। কিন্তু ফল পেয়েও সেই ফল ত্যাগ করে। আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে বিশ্বনাথের কাহিনী শোনাচ্ছি।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

চিত্রকূটে বিশ্বনাথ নামে একজন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। হয়ত পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে বাচ্চা বয়স থেকে তার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ

বেতাল কথা

জেগে ছিল। গানের দিকে তার ঝোঁক দেখে তার বাবা গান শেখার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে ঘুরে গানবাজনা শিখে বিশ্বনাথ বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি ফিরে এসে চাষের কাজে বাপকে বিশ্বনাথ সাহায্য করতে লাগল। সারাদিন ক্ষেতখামারে কাজ করত। দিনের শেষে, সন্ধ্যার সময় সে বারান্দায় বসে বীণা বাজাত, গাইত।

যথাসময়ে বিশ্বনাথের বিয়ে হল। তার স্ত্রীর নাম মীনাক্ষী। মীনাক্ষীও গানবাজনা ভালোবাসতো। তাই সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ যখন বাজাত বা গাইত তখন সেও শুনত। ক্রমশ আরও অনেকে বিশ্বনাথের গানবাজনা শোনার জন্য জড়ো হত। যারা গানবাজনার ভালো বোদ্ধা তারাও বিশ্বনাথকে প্রশংসা করত।

একজন বলল, "বিশ্বনাথ, তুমি গানবাজনা এত ভালো জেনেও ঘরে বসে আছো কেন? তুমি যে কোন রাজার কাছে গেলে তিনি তাঁর রাজসভায় তোমাকে সাদরে রেখে দেবেন। তুমি কেন এখানে ক্ষেতেখামারে সারাদিন পরিশ্রম করছ?"

মীনাক্ষীও মনে মনে এই কথাই পোষণ করত। কিন্তু বিশ্বনাথ কোন রাজাকে
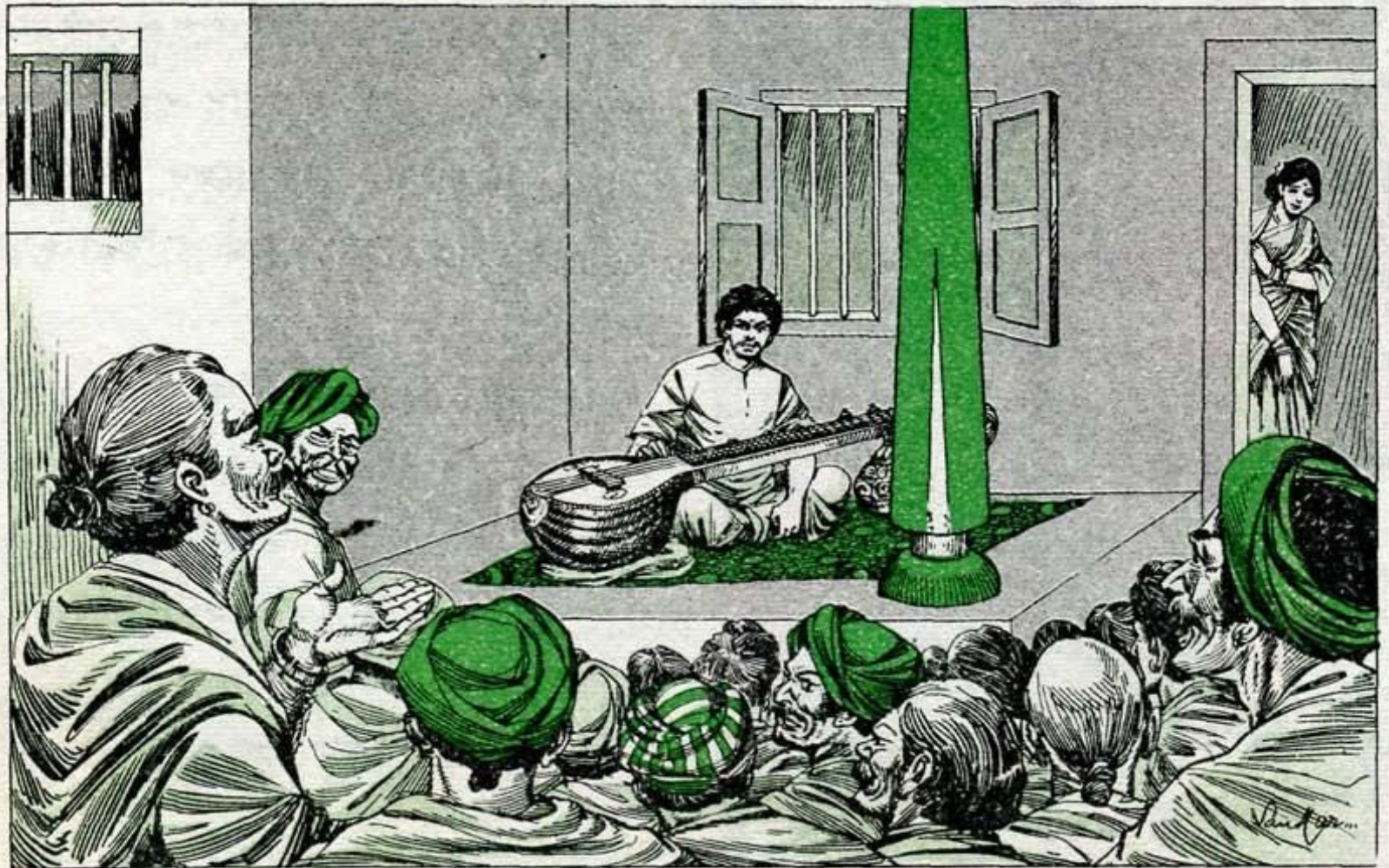
খুশী করার জন্য গান শোনাতে রাজী ছিল না। স্বামীর এই মনোভাব মীনাক্ষী জানত। তাই সে তার স্বামীকে এই ধরণের কোন অনুরোধ করেনি। সে মনে মনে কামনা করত একদিন যেন কেউ এসে তার স্বামীকে সাদরে রাজাকে গান শোনানোর জন্য নিয়ে যায়।

মীনাক্ষীর মনের বাসনা সত্যি সত্যি একদিন পূরণ হল। একদিন বারান্দায় বসে বিশ্বনাথ যথারীতি বীণা বাজাচ্ছিল, কোত্থেকে যেন দুজন লোক এল। ওরা বসে সারাক্ষণ শুনল। পরে চলে গেল।

ঐ দুজন ছিল ছদ্মবেশে। তাই কেউ বুঝতে পারেনি যে ওরা সেই দেশের রাজা এবং মন্ত্রী ছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা বিশ্বনাথকে সাদরে ডেকে পাঠালেন। রাজা বিশ্বনাথকে তার রাজসভায় থাকতে বললেন। বিশ্বনাথ রইল সেখানে। প্রথম প্রথম ঐ জায়গাটা তার কাছে কয়েদ-খানার মত লাগল। তারপর নিত্যনতুন লোক বিশ্বনাথকে প্রশংসা করতে লাগল। নতুন পরিবেশে, নতুন নতুন মানুষের কাছে প্রশংসা পেয়ে ক্রমশ বিশ্ব-নাথের ভালো লাগছিল।

কিছুদিন পরে রত্নপুর থেকে চিত্রকূটে
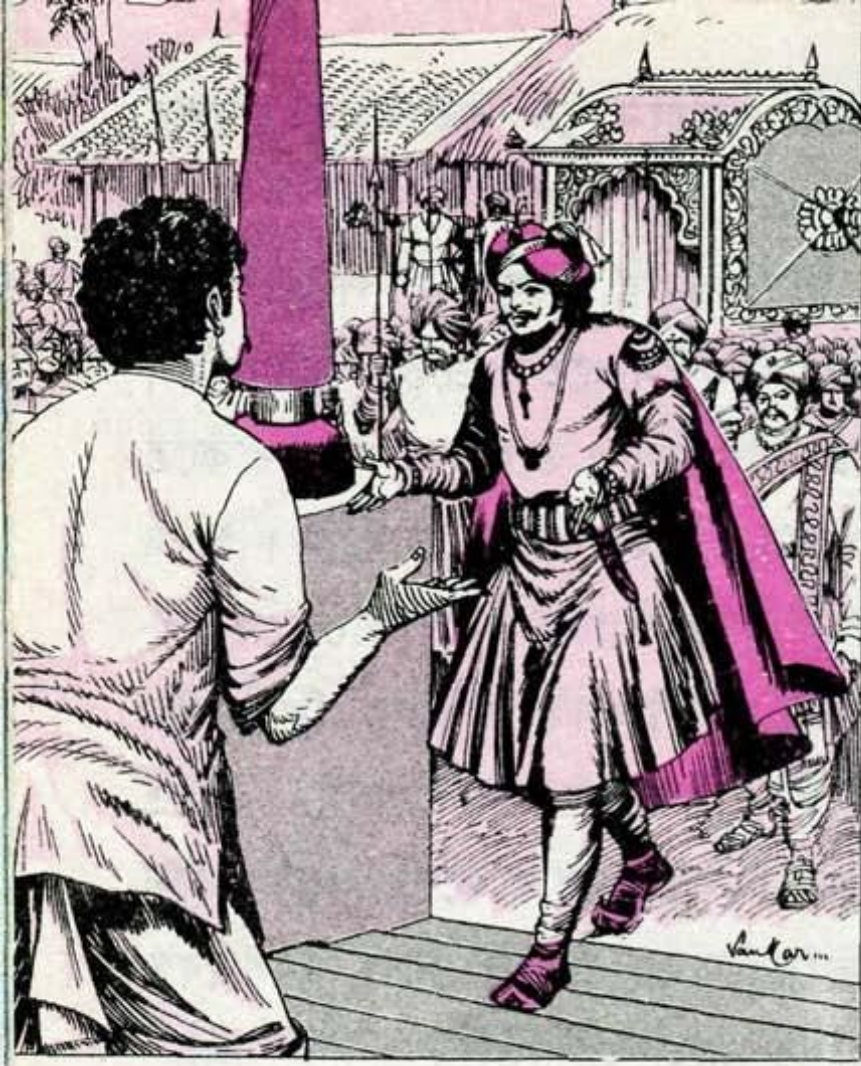
এক সঙ্গীতের পণ্ডিত এল তার শিষ্যদের নিয়ে। তার অনুরোধ অনুসারে রাজা ঐ পণ্ডিত ও বিশ্বনাথের গানের আসর বসাল। ঐ পণ্ডিতের নাম কুঞ্জ। যেহেতু মাত্র দুজনের আসর সেইহেতু সেটাকে একটা প্রতিযোগিতা হিসাবে সবাই নিয়েছিল।

সেই আসরে বীণা বাজিয়ে বিশ্বনাথ খুব একটা জমাতে পারল না। কুঞ্জ আসর মাত করে দিতে পেরে ছিল।

তারপর থেকে বিশ্বনাথের মনে হল রাজা এবং রাজার আশেপাশে যারা থাকে তারা তাকে আগের মত প্রশংসা করছে না।

"তোমার কি হয়েছে বল তো? প্রত্যেকের ভাগ্যে জয়-পরাজয় আছে।" মীনাক্ষী বলল।

"দেখ, আমি ব্যথা পাচ্ছি রাজার ব্যবহারে।" বিশ্বনাথ বলল।

তারপর বিশ্বনাথ মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিল। সে নিজের গানের চর্চা বাড়িয়ে দিল। ছ মাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে সে আরও উন্নতি করল।

ছ মাস পরে বিশ্বনাথ রত্নপুরে গেল। কুঞ্জকে গানের আসরে আহ্বান করল। দর্শকরা এবারে আরও ভালো করে বুঝল যে এটা একটা তীব্র প্রতিযোগিতার আসর হবে। সেই আসরে কুঞ্জ শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হল।

কুঞ্জকে পরাজিত করে ফিরে আসার পর স্বয়ং রাজা গেলেন বিশ্বনাথের কাছে অভিনন্দন জানাতে। গত ছ মাস বিশ্বনাথের প্রতি যে অবহেলা দেখানো হয়েছে তার জন্য রাজা ক্ষমা চাইলেন।

"মহারাজ, আমার ইচ্ছে করছে গ্রামে ফিরে যেতে। আমাকে অনুগ্রহ করে বিদায় দিন।" বিশ্বনাথ বলল।

গ্রামে ফিরে এসে বিশ্বনাথ আগের মত চাষ আবাদের কাজ করে, দিনের শেষে গানবাজনা করত। গ্রামের লোক তাকে ঘিরে বসে গান শুনত। এইভাবে বিশ্বনাথ তার বাকী জীবন কাটিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, বিশ্বনাথকে তাহলে কি ধরণের লোক বলা যায়? প্রথম আসরের পরে যে বিশ্বনাথ মন মরা হয়ে গেল, ছ মাস ধরে গানের চর্চা বাড়িয়ে দিল, সেই বিশ্বনাথ দ্বিতীয় আসরে কুঞ্জকে পরাজিত করে রাজসভা ছেড়ে দিল কেন? কত সুখে ছিল সে! সেই সুখ ছেড়ে, অত ভালো পরিবেশ ছেড়ে সে ফিরে এল কেন চাষের কাজে? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহালে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "বিশ্বনাথ গান-বাজনায় যেমন পণ্ডিত ছিল তেমনি সে তার প্রেমিক ছিল। সে আনন্দ পাওয়া এবং দেওয়ার জন্যে গান গাইত বা বীণা বাজাত। পেট ভরানোর জন্য সে চাষের কাজ করত। পণ্ডিত কুঞ্জের কাছে পরাজিত হয়ে সে অপমান বোধ করেনি। অপরপক্ষে রাজা খুব অপমানবোধ করেছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনাথের প্রতি ব্যবহার আগের মত করেন নি। বিশ্বনাথ চর্চা বাড়িয়ে প্রমাণ করে দিল যে জয় পরাজয় চর্চার উপর নির্ভর করে। গানবাজনাকে জীবিকা হিসাবে নেওয়া ঠিক নয় ভেবে বিশ্বনাথ ফিরে গেল চাষের কাজে।"

এইভাবে রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

ঘরের ছেলে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি একজন মহা-পণ্ডিত। তোমার মত পণ্ডিতকেও দেখছি পরিবেশের দাস হয়ে যেতে। এতে আমি অবাক হচ্ছি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও সুবর্ণ সুযোগগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তোমাকে এক অরণ্যবাসী বীর যুবকের কাহিনী বলছি। তার নাম বীরু। এই কাহিনী শুনলে তোমার পথ চলার পরি-শ্রমও কমে যাবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

বেতাল কথা

একটি সাদা বাঘ ঢুকে যখন তখন যাকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতো। এই খবর পেয়ে মলয়সেন ঐ বাঘ মারার জন্য বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাঘকে পাওয়া গেল না। রাজার সঙ্গে ছিল দু'জন দেহরক্ষী। ওরা হঠাৎ একই সময়ে তরবারি তুলে রাজাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য রাজা প্রস্তুত ছিল না। তবু তরবারি তুলে তাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করল মলয়সেন।

প্রাচীনকালে কামরূপ দেশের রাজা ছিল মলয়সেন। তার ছেলেমেয়ে ছিল না। বয়সও তার হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধীকারী কেউ না থাকায় ঐ দেশটিকে ছলে বলে কৌশলে দখল করার চেষ্টা অনেকেই করেছিল। বহুবার তাকে মেরে ফেলার চক্রান্তও হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত মলয়সেন প্রত্যেকবারই বেঁচে গিয়েছিল। কারা যে ঐ চক্রান্ত করছিল তা সঠিকভাবে খোঁজ করাও মলয়সেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই যখন অবস্থা তখন পূর্বদেশ থেকে

দুজন দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে একা বৃদ্ধ মলয়সেন পারবে কেন? বেশ বোঝা যাচ্ছিল রাজার মৃত্যু ওদের হাতে নিশ্চিত। এমন সময় এক অরণ্যবাসী যুবক এসে একজন দেহরক্ষীকে মেরে ফেলল। তাকে মেরে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ও ঐ যুবকের আক্রমণের ফলে অন্য দেহরক্ষীও মারা পড়ল।

ঐ যুবক ছিল অরণ্যবাসী ডাকাতদের সর্দারের ছেলে। তার নাম বীরু। বীরুর বাবা ছিল শিকারে ওস্তাদ। রাজভক্তির জন্য যে বীরু মলয়সেনকে বাঁচিয়েছিল তা

নয়, সে লক্ষ্য করেছিল দুজন যুবক মিলে একজন বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করছে। ঐ দৃশ্য দেখে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। এটা মলয়সেন জানত না। সে যুবকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার সঙ্গে রাজধানীতে যেতে বলল। রাজধানী বস্তুটা যে কি ধরণের তা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল বীরুর মনে। তাই সে যেতে রাজী হল।

রাজধানীতে পৌঁছানোর পর মলয়সেন বলল, "দেখ বীরু, আমাকে অনেকবার অনেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমার ছেলেপুলে না থাকায় সবাই চাইছে সিংহাসনে বসতে।"

খেতে বসে দুগাল খেতে না খেতেই মলয়সেনের শরীর খারাপ হল। কারণ ঐ খাদ্যে বিষ মেশানো ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবৈদ্য ও প্রধানমন্ত্রী ছুটে এল। বৈদ্যের ওষুধে কোন কাজ হল না। মলয়সেন বীরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঘোষণা করে মারা গেল।

চোখের পলকে যা ঘটে গেল তাতে বীরু অবাক হল। যা দেখছে যা শুনছে সবই তার কাছে নতুন। তার ইচ্ছে করল তক্ষুণি পালাতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার আগ্রহ হল রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা জানার।

সিংহাসনে বসার পর বীরুকেও মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রত্যেকবারই বিপদের হাত থেকে সে বেঁচে যেতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় দেশের চারদিকে ডাকাতি শুরু হল। বীরু বুঝতে পেরেছিল কারা ঐ ডাকাতি করছে।

কিছুদিন পরে সেনাপতি বীরুর কাছে এসে বলল, "মহারাজ, একজন ডাকাতকে

আমরা ধরতে পেরেছি। আপনার নির্দেশ পেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি।"

বীরু কারাগারে এসে অপরাধীকে দেখতে চাইল। বীরুকে দেখেই আনন্দে ঐ ডাকাতের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঐ ডাকাতটি ছিল বীরুর দলের ডাকাত। মাঝরাত্রে বীরু তার ডাকাত সঙ্গীকে মুক্ত করে অরণ্যে পালিয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, বীরু রাতারাতি সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছিল বলে? না কি সে বুঝেছিল যে দেশ শাসন করার ক্ষমতা তার মধ্যে নেই? রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা কি সে জানতে পেরেছিল? ডাকাতকে বীরু দিনের বেলায় মুক্ত করল না কেন? আমার এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "বীরুর উপর হত্যার চক্রান্ত চলছিল বলে সে ভয় পায়নি। তার দলের লোককে কারাগারে দেখার পর এক সমস্যা দেখা দিল। রাজা হিসাবে ঐ ডাকাতকে মুক্ত করলে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ত যে রাজা ডাকাতকে মুক্ত করেছে। ফলে অপমানিত হয়ে একদিন তাকে সিংহাসন ছাড়তে হত। সিংহাসন নিয়ে যখন অনবরত চক্রান্ত চলছিল তখন কে বা কারা তা করছে তা জানার কৌতুহল বীরুর মধ্যে কমে গেল। রাজধানীর জীবনের চেয়েও তার কাছে অরণ্যের জীবন বেশী প্রিয় ছিল।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল সব নিয়ে পালিয়ে গেল ঐ গাছে।" (কল্পিত)
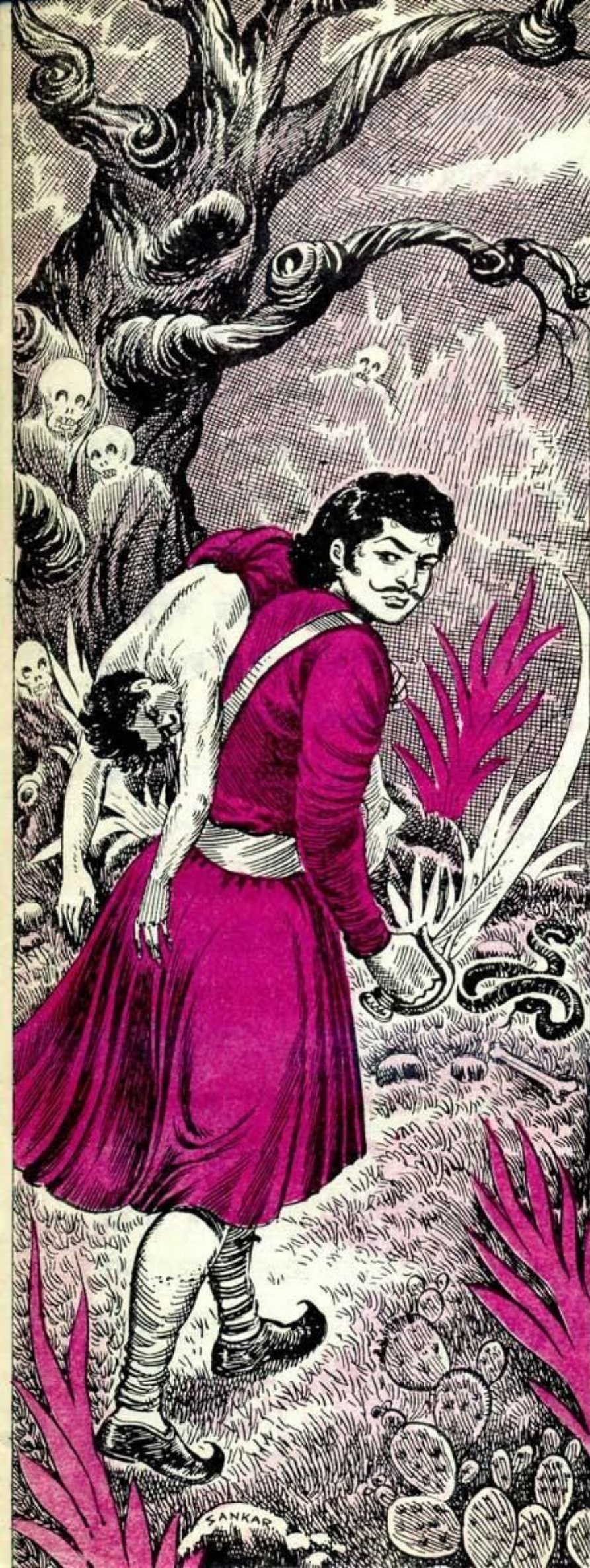
বোকার কাহিনী

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, “রাজা, তুমি স্বেচ্ছায় এই পরিশ্রম করছ কিনা জানিনা। তবে অনেকে স্বেচ্ছায় বিপদের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়। হাতের কাছে লাভের সুযোগ এলেও ওরা তা পায়ে ঠেলে দেয়। এই ধরণের এক বোকার কাহিনী বলব। তার নাম চন্দ্রহাস। আমার কাহিনী শুনলে পথ চলার পরিশ্রম কমে যাবে।” বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

প্রাচীনকালে রবিবর্মা ও শিববর্মা নামে দুজন রাজা পাশাপাশি ছিল। ঐ দুটো

বেতাল কাহিনী

দেশের মধ্যে যখন তখন ঝগড়া বিবাদ এমন কি যুদ্ধও হত। আবার দুজনের মধ্যে কোন রাজাই যোগ্য ছিল না।

রবিবর্মার মেয়ের স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠাল শিববর্মার ছেলে চন্দ্রহাসকে। বিশেষ দূতের মাধ্যমে রবি-বর্মা তাকে আমন্ত্রণ জানাল। দূত আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলে এলো। তার কথার মূল সুর ছিল, যদি এর ফলে উভয় দেশের রাজার মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয় তাহলে ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল হবে।

এই কথা শুনে শিববর্মা খুব খুশী হল। কারণ তার ছিল একটি মাত্র ছেলে। আবার রবিবর্মার ছিল একটি মেয়ে। চন্দ্রহাসের সঙ্গে যদি রবিবর্মার বিয়ে সত্যি সত্যি হয় তাহলে ভবিষ্যতে দুটো দেশেরই রাজা হবে চন্দ্রহাস। চোদ্দপুরুষ যুদ্ধ করে যা পারেনি চন্দ্রহাস রবিবর্মার মেয়েকে বিয়ে করে তাই পারবে।

এই সব কথা ভেবে শিববর্মা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে চন্দ্রহাসকে পাঠাতে চাইল। চন্দ্রহাসের কিন্তু যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাপের কথা উপেক্ষা করতেও তার ইচ্ছে করল না। শেষে তার বন্ধু সুবুদ্ধিকে নিয়ে রবিবর্মার দেশে গেল।

বনপথে দুই বন্ধুতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা শিকারীদের খপ্পরে পড়ে গেল। ওরা তাদের বন্দী করে সর্দারের কাছে নিয়ে গেল।

সুবুদ্ধি ওদের সর্দারকে বুঝিয়ে বলল, ওরা কোথায় কোন্ উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। ওদের কথায় কান না দিয়ে সর্দার বলল, "তোমরা যেই হও, যে উদ্দেশ্যে যেখানেই যাও, আমাদের খপ্পরে যখন পড়ে গেছ তখন আমাদের দেবীর কাছে বলি দেবই।

আর যদি বলি হতে না চাও আমাদের কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়তে হবে। লড়ে যদি জিতে যাও তারপর এখান থেকে যেতে পারবে।”

“ঠিক আছে আমি তোমাদের ঐ বীরপুরুষের সঙ্গে লড়ব।” বলল চন্দ্রহাস।

“ওরে, এদের চোখ খুলে দে। এরা ঘুরে বেড়াক। কাল সকালে লড়াই হবে।” বলল সর্দার।

শুধু যে চন্দ্রহাস ও সুবুদ্ধিকে বেড়াতে দিল তাই নয় সেই রাত্রে ওদের দুজনের ভালো খাবারেরও ব্যবস্থা করল সর্দার।

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে সুবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বলল, “চন্দ্রহাস, আমি লক্ষ্য করেছি কেউ আমাদের পাহারা দিচ্ছে না। চল পালাই। তুমি জান না, এরা এই বনেই থাকে। এদের গায়ে অনেক জোর। এদের সঙ্গে লড়ে তুমি কোন-ক্রমেই জিততে পারবে না।”

“কাপুরুষের মত পালানোর চেয়ে বীরের হাতে মরা ভালো। ওরা আমাদের বিশ্বাস করে ছেড়েছে বলে ওদের আমরা ধোকা দিয়ে পালাবো? আমার তো মনে হচ্ছে আমাদের আর কোন ভয় নেই।” চন্দ্রহাস বলল।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে চন্দ্রহাস

ও একজন বীর শিকারীর মধ্যে লড়াই শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রহাস জয়ী হল। তৎক্ষণাৎ সর্দার চন্দ্রহাস ও সুবুদ্ধিকে সসম্মানে বিদায় দিল।

রবিবর্মা চন্দ্রহাসকে দেখে খুব খুশী হল। স্বয়ম্বর সভায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। রবিবর্মা চন্দ্রহাসকে বলল, "কাল তোমার এবং কমলনাথের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। যে জয়ী হবে তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে।"
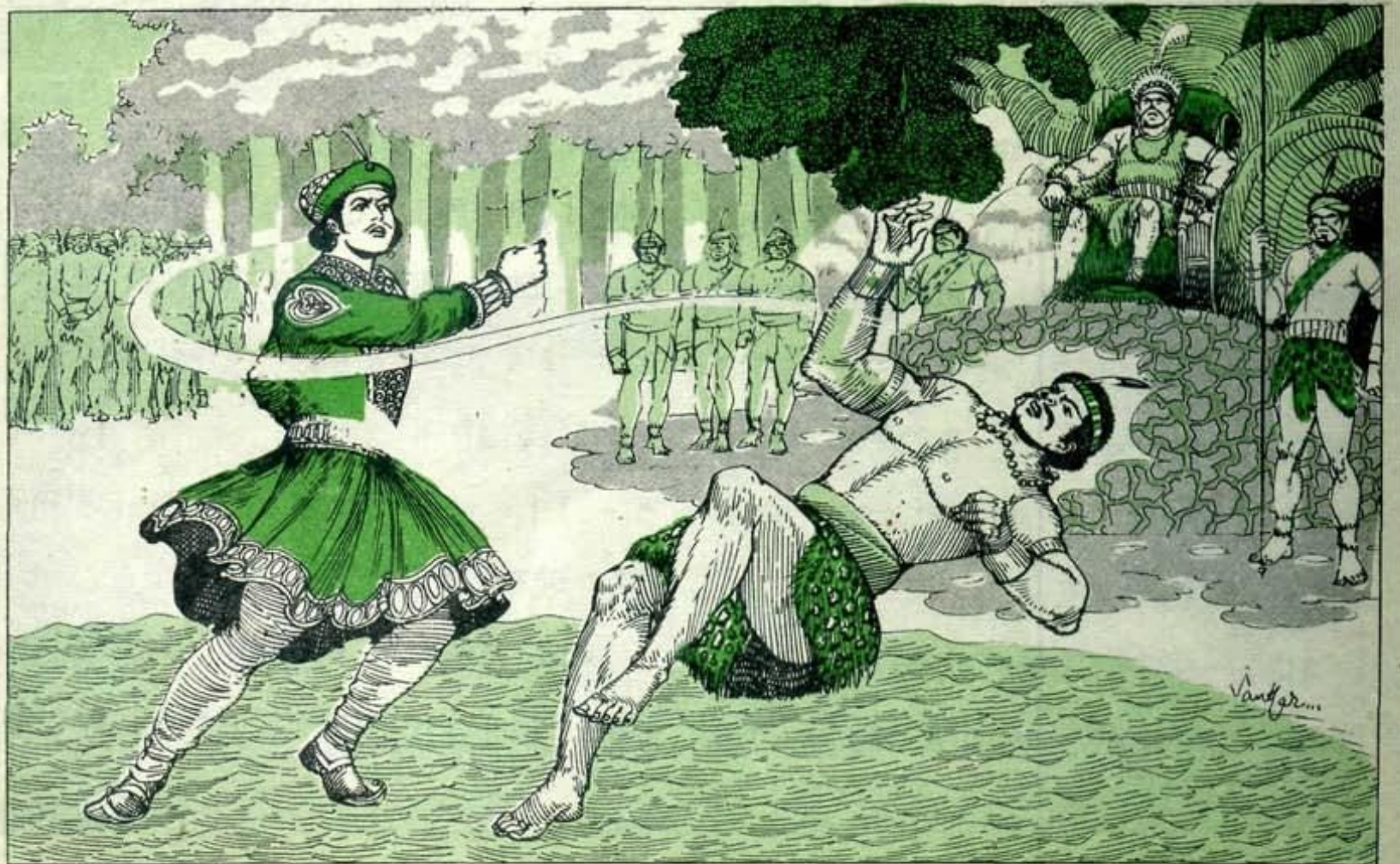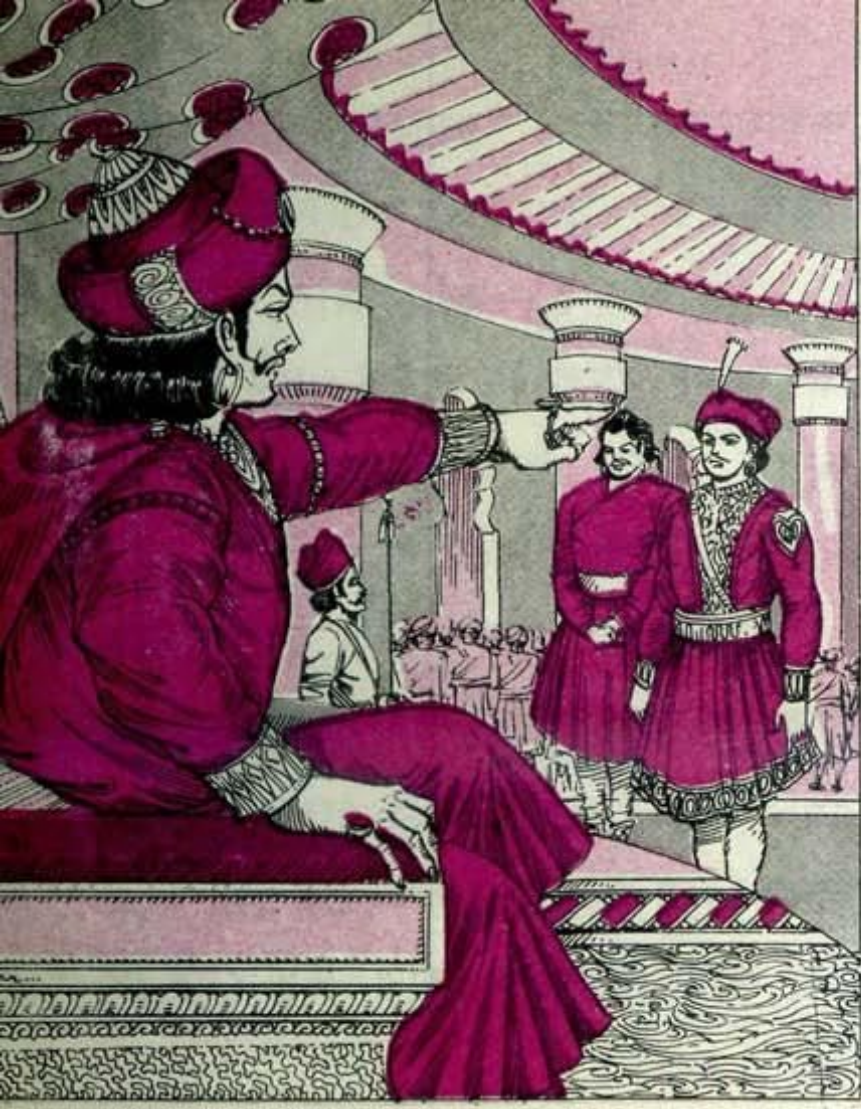
রাত্রে সুবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বলল, "এই রাজার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। যে সব রাজকুমার স্বয়ম্বর সভায় এসেছে তাদের প্রত্যেককেই তো তুমি আজকে পরাজিত করেছ। কালকে আবার কমলনাথের সঙ্গে লড়তে হবে কেন? কমলনাথ কে? আজকে সে আসেনি কেন? তুমি বললে আমি এসব প্রশ্ন রাজাকে গিয়ে করে আসতে পারি। বল যাবো?"

"না, না, যেতে হবেনা, আসল ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি" বলে চন্দ্রহাস পাশ ফিরে শুলো।

মাঝরাত্রে উঠে চন্দ্রহাস সুবুদ্ধিকে জাগিয়ে বলল, "সুবুদ্ধি চল পালাই। সকালের আগেই আমাদের এই দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।"

এই কথা শুনে সুবুদ্ধির ঘুম ছুটে গেল। সে বলল, "সে কি! তুমি কালকে কমলনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না? এত রাজকুমারকে হারিয়েছ আর তাকে হারাতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। রবিবর্মার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবেই হবে।"

কিন্তু চন্দ্রহাস সুবুদ্ধির কথা কানে তুলল না। সে এগিয়ে গেল। অগত্যা

সুবুদ্ধিকেও যেতে হল তার পেছন পেছন।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, চন্দ্রহাস আসলে কি? বোকা? সাহসী? না কাপুরুষ? শিকারীদের সর্দারকে সে ভয় পেল না। ওদের বীরের সঙ্গে লড়ে জয়ী হল। স্বয়ম্বর সভায় যেসব রাজকুমার এসেছিল তাদের সে পরাজিত করল। আবার সে-ই রাত্রের অন্ধকারে সুবুদ্ধিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। পরের দিন সকালে কমলনাথের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হত। চন্দ্রহাস কি ভয় পেয়েছিল না অন্য কোন কারণ ছিল?"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "চন্দ্রহাস আসলে বুদ্ধিমান, সাহসী ও গভীর আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার রাতারাতি পালিয়ে আসার একটি মাত্র কারণ হল রবিবর্মার বিশ্বাসঘাতকতা। স্বয়ম্বর সভায় যারা এসেছিল তাদের প্রত্যেককে পরাজিত করার পর, পরের দিন আর একটি প্রতিযোগিতা করার কোন কারণ ছিল না। তবু রবিবর্মা যখন তা করল তখন চন্দ্রহাস বুঝে নিল যে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রবিবর্মার নেই। শিববর্মার মত চন্দ্রহাসও ভেবেছিল আত্মীয়তা উভয় দেশের মধ্যে স্থাপিত হলে দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ হবে না। চন্দ্রহাসও শান্তি চেয়েছিল। কিন্তু শেষে সে বুঝল রবিবর্মার উদ্দেশ্য। বুঝে সে রাতারাতি নিজের দেশের দিকে রওনা দিল।"

রাজা এইভাবে কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)